সংবাদ প্রতিদিন ১ জুলাই ২০০৭

# রোববার

## বিধির বিধান

সংবাদ প্রতিদিন এর সঙ্গে বিনামূ

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

## একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

ঐশ্বর্য্যর বিয়ের আরো গয়নার ছবি দেখুন পরের সংখ্যায় ।

নবপরিণীতা বাঙালি বধূর সলাজ হাতে পলা - এও চিরপুরাতন, চিরপরিচিত রীতি। সেই প্রথানুযায়ী তৈরী হয়েছে সূক্ষ্ম তারের কাজে ঢাকা লাল পলা - এমন পলা নাইলে কি আর বিশ্বসুন্দরীর হাতে মানায়। বিশ্বসুন্দরীর বাঙালি গয়নার প্রস্তুতকারক কলকাতার একমাত্র জুয়েলার 'অঞ্জলি জুয়েলার্স'।

অঞ্জলি জুয়েলার্স™

www.anjali.bz

গোলপার্ক ঃ ২৮এ, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-২৯, ফোন ঃ ২৪৪০ ১৭৯২ / ২৪৬০ ০৫৮১
সল্টলেক ঃ বি. ই. ১০১, কোয়ালিটি মোড়, কলকাতা - ৬৪, ফোন ঃ ২৩২১ ২০৫৭ / ২৭৮৬
সল্টলেক ঃ এইচ. এ. - ৩, সেক্টর - III, GD আইল্যান্ডের পাশে, কলকাতা- ৯৭, ফোন ঃ ২৩২১ ৮৩১০ / ১১
বেহালা ঃ ৫২২সি, ডায়মন্ডহারবার রোড ( স্টেট ব্যাঙ্কের পাশে ) কলকাতা - ৩৪, ফোন ঃ ২৪৪৫ ৫৭৮৪ / ৮৫
(নতুন শোরুম) "অঞ্জলি বাটী", শোভাবাজার ঃ ৩৮, অরবিন্দ সরণী, কলকাতা - ৭০০০০৫
(শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনের পাশে) ফোনঃ ২৫৩৩ ৫৮৩২ / ৫৮৩৪
এছাড়া আমাদের আর কোন শো - রুম নেই

theadventure@mail.com

# রোববার

১ জুলাই ২০০৭


**লেটারবক্স**
পাঠকের পাতা ৪

**ফার্স্ট পার্সন**
ঋতুপর্ণ ঘোষ ৬

**ভালো-বাসার বারান্দা**
নবনীতা দেবসেন ১০

**এবার মলাট**

বিধির বিধান
**শ্রীনিরপেক্ষ ১২**

রয়াল হাইনেস
**শংকর ঘোষ ১৮**

**রোববারের রামপ্রসাদী**
আয় মন বেড়াতে যাবি
সুব্রত মুখোপাধ্যায় ২৪

**বাংলার মুখ**
পথের পাঁচালি
জয়া মিত্র ৩০

**রোববারের মেগা**
কলিকাতায় নবকুমার
সমরেশ মজুমদার ৩৩

**কমিকস**
বাতিকবাবু
অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৩৬

**সেন সলিউশনস**
রাইমা সেন ৩৮

**রান্নাঘরে রেস্তোরাঁ**
পিটার ক্যাট-এর
চেলো কাবাব ৪০



টিম রোববার

অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়
অর্পিতা চৌধুরী
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
নীলাঞ্জনা বসু
প্রসূন চক্রবর্তী
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী
বিপুল গুহ
রিংকা চক্রবর্তী
শান্তনু দে
সন্দীপন মজুমদার
সুপ্রিয় দাস

প্রচ্ছদের ছবি
মোনা চৌধুরি

সৌজন্য

বিধানচন্দ্র রায়ের
বাসভবনের সকলে

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক
বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

# নবপত্রিকা

**১৫ এপ্রিল দিনটি ছিল রবিবার।** তবে তা আর পাঁচটা রবিবারের মতো নয়। দস্তুরমতো ১৪১৪ বঙ্গাব্দের যাত্রা শুরুর দিন, পয়লা বৈশাখ। তাই সেদিন স্বাভাবিকভাবে প্রায় প্রতিটি বাংলা দৈনিকই স্থূল কলেবরে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তবে তাতে পাঠকের তেমন কিছু খোরাক ছিল না। ব্যতিক্রমী চেহারায় চোখে পড়ল শুধুমাত্র ঋতুপর্ণ ঘোষের রোববার।

ওই সংখ্যায় রোববার তার নিয়মিত বিভাগগুলো বাদ দিলেও খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের ছবিসহ রচনা প্রকাশ করে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে।

ওই সংখ্যার 'ফার্স্ট পার্সন'-এ ঋতুপর্ণ ঘোষ যে জিজ্ঞাসা তুলে ধরেছেন—

'যে জীবন আজ দিগন্ত ফুঁড়ে এল...

জীবনের কাছে মাথা নিচু করে।

বুদ্ধদেব গুহ থেকে স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সবার মনে ও মুখে সেই জিজ্ঞাসার ছাপই ফুটে উঠেছে।

কেবল ব্যতিক্রমী—দেখলাম আবুল বাশারকে। মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে তিনি বোধহয় অন্ধকারের মাঝে আলোর ঠিকানা খুঁজে চলেছেন। 'ফার্স্ট পার্সন'-এর শেষ কথাটা বোধহয় তিনিই বলতে চেয়েছেন।

'জীবনের কাছে তিল তিল করে পাওয়া...
নব আনন্দে জগৎ জ্যোতির্ময়।'

মহম্মদ রায়হান
হাওড়া

## আনন্দের সন্ধান

১৪১৪-এর ভোরবেলায় এক অসীম আনন্দের সন্ধান দিল রোববার। হাতে পেলাম 'নব আনন্দে'। দেখলাম প্রায় হারিয়ে যাওয়া বাঙালির মুখ। যে মুখের 'আলো' ইদানীং 'আঁধারের মাঝখানে' থেকে ক্লান্ত, বিষণ্ণ, একা। সারা বছরের নির্মমতা, নির্জনতা, নির্লজ্জতার মেঘ সরিয়ে স্বচ্ছ রোববার বাংলা বছরের প্রথম রবিবারকে মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করল। বাঙালির মুখোমুখি বাঙালিকে দাঁড় করালো। সত্যিই তো এমন প্রাণের আরাম, মনের শান্তি আর কোথায়?

হীরালাল শীল
কলকাতা-১২

## নাড়িয়ে দিল মন

পয়লা বৈশাখের দিন রোববারের বিশেষ গল্পসংখ্যাটি উপহার পেলাম। প্রতিটি গল্পই মনকে দারুণভাবে নাড়িয়ে দিল। আশা করি, আগামী দিনে আরও অনেক গল্পসংখ্যা উপহার পাব। এছাড়াও 'সেন সলিউশনস' বিভাগটি আমার খুবই প্রিয়। রোববারের কাছে আমার একটা অনুরোধ, খেলাধুলো নিয়ে কোনও নিয়মিত বিভাগ চাই। এতে আমার মতো অনেক ক্রীড়াপ্রেমী পাঠকসমাজ উপকৃত হবে। আর কিছু চাই না। শুধু চাই, রোববার দীর্ঘজীবী হোক।

সুমন্ত সিংহ চৌধুরি
দশঘরা, হুগলি

## আরও গল্পসংখ্যা চাই

পয়লা বৈশাখে রোববারের 'নব আনন্দে' সংখ্যায় বিশেষ গল্পসংখ্যা এবং 'ফার্স্ট পার্সন' পড়ে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। রোববারের প্রতি সংখ্যায় এই ধরনের একটি করে গল্প থাকলে ভাল হয়। এছাড়া আর একটা অনুরোধ আছে। ফেলে আসা বছরের বেশ কিছু লেখক, কবি, সাহিত্যিক আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। যদি তাঁদের জীবনী ও গল্প ছাপেন, তাহলে তো খুবই ভাল হবে। পাঠক হিসাবে শুধুমাত্র এটাই আবদার রইল রোববারের কাছে।

সুবীর কুমার বসু
হুগলি

## চমকে গেলাম

আকস্মিকভাবে আমার মেয়ের বাড়ি গিয়ে পয়লা বৈশাখ-এর 'নব আনন্দে' সংখ্যাটি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।

বইটা খুলেই চমকে গেলাম। আটজন খ্যাতনামা লেখক যাঁরা আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং পছন্দের—তাঁদের রচনা এবং তার সঙ্গে ন'টি রঙিন কলম—অত্যন্ত সিম্বলিক। আরও ভাল লাগল প্রিয় লেখকদের ছবিগুলো পেয়ে।

কিন্তু যে কবিতা দিয়ে নববর্ষকে আবাহন জানানো হল—নতুন প্রভাত এসে অন্ধকার দূর করুক এই প্রার্থনা জানানো হল—সেই লেখকের ছবি কেন দিলেন না? নিজের ছবি দিতে নেই বলে? অবশ্য তার বদলে যে ছবিটি পেলাম সেটা এত ভাল যে সব ক্ষোভই দূর হয়ে গেল।

আমার অত্যন্ত প্রিয় লেখক বুদ্ধদেব গুহর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় সেই 'গুগুনো গুম্বার'-এর দেশে ঋজুদার হাত ধরে। আর, তাঁর এই গল্পটা শেষ করার আগে তো দম ফেলতেই পারিনি!

দিব্যেন্দু পালিতের লেখা পড়েও বেশ আনন্দিত হয়েছি। আর অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তো একদম বাস্তব জীবনকে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখাটিও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। সত্যিই, প্রতিটি লেখকের লেখাগুলো মনে রাখার মতো। বিশেষ করে 'দু'কামরা বাড়ি' আর 'মাটি আর মানুষের সাতটি' অত্যন্ত গভীর চিন্তার খোরাক জোগায়। মনে হয় এই-ই আমাদের সত্যিকারের ভারতবর্ষ। আমরা দু'কামরা বাড়ি থেকে বেরতে পারব না হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও, আর মাটির লড়াইও চিরকালই থাকবে।

শুধু একটা প্রশ্ন, আপনাদের শারদীয়া সংখ্যায় কি এঁদের দেখা পাব? পেলে তার সঙ্গে নীরেন চক্রবর্তী মহাশয় কি তাঁর ভাদুড়ি মশাইকে হাজির করাবেন? তার সঙ্গে যদি কাকাবাবুর হাত ধরে সন্তু আসে তবে তো সোনায় সোহাগা! উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

রঞ্জিত কুমার ভট্টাচার্য
ভবানীপুর

## মাদকতা লেগে গেছে

নিয়মিত রোববার পড়তে পড়তে মাদকতা লেগে গেছে। পয়লা বৈশাখ-এর বিশেষ গল্পসংখ্যাটিও অনবদ্য। ঋতুপর্ণ ঘোষ-এর কবিতা 'নব আনন্দে...' কবিতাটিতে রয়েছে অসীম ভরসা-বাণী।

বুদ্ধদেব গুহ-র 'রিকি জোনস এবং আমি' রহস্যমাখা এক সুন্দর গল্প। অরণ্য প্রকৃতি ও পশুপাখির একাত্মতায় মানুষের কথা বর্ণনায় বরাবরই পারদর্শী তিনি। সেই পরিচয় রেখেছেন এই গল্পেও।

'নদী এবং সমুদ্র দুই আমার কাছে নারী মহিমার এক বিশেষ মাধুর্য'—'জীবনের মাধুর্য' গল্পে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটিতে এমন অনুভব, নরনারী ও প্রকৃতির মধ্যে অভিনব এক সম্পর্ক—পাঠককে ভাবিয়ে তোলে।

বহুদিন পরে এক ঝলক পাওয়া গেল সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর 'এ গল্প কার গল্প?'তে। মানুষের জীবন ও মনকে নিয়ে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা বোধহয় একমাত্র সঞ্জীববাবুরই মানায়।

আর আবুল বাশারের 'বোন'কে বাঁচাতে ভাইদেরও যে লড়াই চলে, সমাজের ধমনীতে তার কাহিনি সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'মাটি আর মানুষের সাতটি' গল্পটি জীবনকে নাড়া দিয়ে যায়। সব মিলিয়ে 'নব আনন্দে' সংখ্যার জন্য রোববারকে অনেক ধন্যবাদ।

প্রদীপরঞ্জন দাস
কলকাতা-৫৯

**চিঠি পাঠাবার ঠিকানা :**
লেটার বক্স, রোববার
সংবাদ প্রতিদিন
২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০৭২
**ই-মেল :**
robbar.pratidin@gmail.com
**ফ্যাক্স :** 22127977

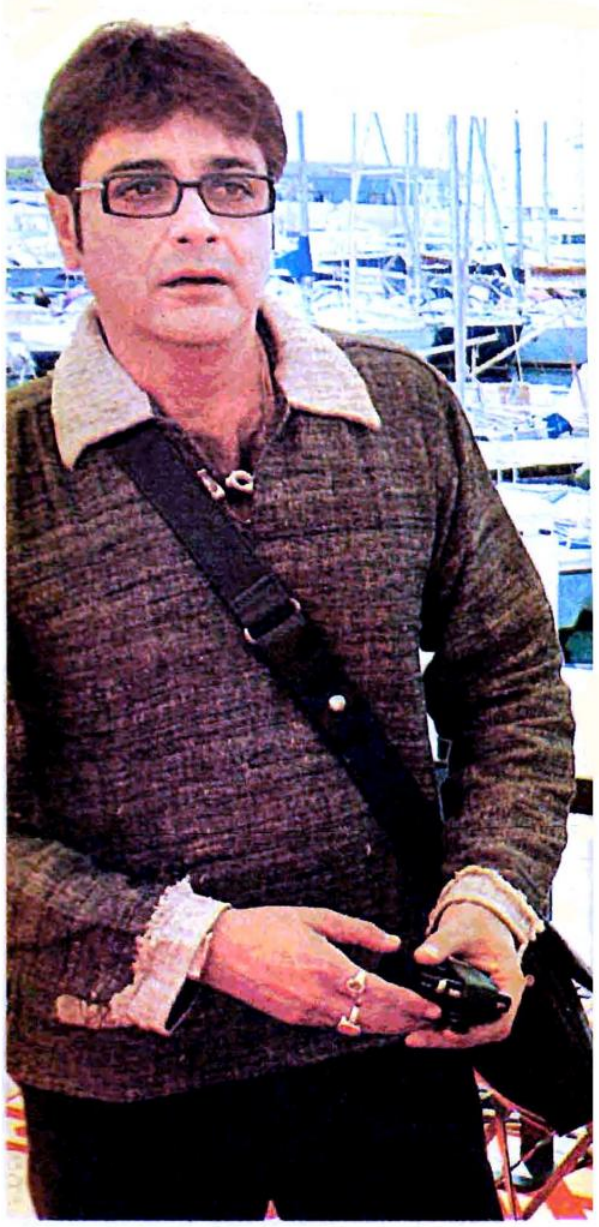

**কলকাতা শহরে, বা পশ্চিমবঙ্গে, আমার মতো অনেকেই যাঁরা ষাট সালের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে স্কুল যেতে শুরু করেছেন, তাঁদের অনেকেরই প্রথম বিদেশভ্রমণ সিনেমার পর্দায়—হয় 'আফ্রিকান সাফারির' তিনঘণ্টার মাসাইমারা সফর বা 'সাউন্ড অফ মিউজিক'-এর পাহাড়ঝর্না ঢালুজমি বেষ্টিত অস্ট্রিয়ার প্রান্তর।** জায়গাগুলোকে হয়তো মানচিত্রে তাদের যথাযোগ্য পরিচয় হিসাবে চিনি না। তবু যে এটা বিদেশ, আমার নিজের দেশ নয়—সে কথা সহজেই বুঝতে পারি।

আরেকটু বড় হয়ে যখন হিন্দি সিনেমা দেখতে শুরু করলাম, আর গানের দৃশ্যগুলো বারবার করে সুরেলা পর্যটনে নিয়ে যেত নিসর্গপিপাসু মনকে, ততদিনে কেমন যেন কী একটা রহস্যময়ভাবে জেনে গিয়েছি যে হিন্দি ছবির অধিকাংশ শুটিং-ই সুইৎজারল্যান্ড-এ হয়। ঠিক যেমন কী একটা ভাবে জানতে শুরু করেছি, যে ক্লাসের অমুক ছেলেটা তমুক মেয়েটার বন্ধু নয়, বয়ফ্রেন্ড।

সুইৎজারল্যান্ড প্রথম যখন যাই, সে বছর চারেক পূর্বে, ততদিনে আমি ছবি করিয়ে। অপটু কারিগর, আইফেল টাওয়ারের সামনে গিয়ে ঠিক কোথায় কোথায় নাটবল্টু লেগে থাকতে পারে, তার সন্ধান করে। আমিও অপরিণত চলচ্চিত্র কর্মী, সুইৎজারল্যান্ডে পদার্পণ করেই প্রথম আবিষ্কার করলাম যে সেখানে সন্ধে হয়। মানে সূর্যাস্ত পরবর্তী অন্ধকার নামে রাত্রি ন'টার আশপাশে—আমি গ্রীষ্মকালের কথা বলছি। একে অপরিণত, তায় কম বাজেটের ফিল্ম করিয়ে। একটা হিসাব পরিষ্কার মনের মধ্যে খেলে গেল যে, এখানে সারাদিনের আউটডোর শুটিং-এর অবকাশ অনেক বেশি—কারণ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের ব্যবধান প্রায় তেরো চোদ্দো ঘণ্টা—ইন্ডাস্ট্রির হিসাবে টানা দেড় শিফ্‌ট।

গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ ফ্রান্সও তার ব্যতিক্রম নয়। চোখে কালো পট্টি বেঁধে মাঝরাস্তায় নিয়ে গিয়ে চোখের বাঁধন খুলে দিলে যে কোনও হতচকিত কলকাতাবাসীই বলবেন—এখন খুব জোর হলে বেলা তিনটে। রোদের তেজ এবং দীপ্তি সমান বিভ্রান্তিকর। টুকিটাকি কিছু কেনাকাটা করার পর ফুটপাথ ঘেষে হাঁটছি। সরু রাস্তা। আমাদের উত্তর কলকাতার অনেক এলেবেলে গলিও এর থেকে চওড়া। ফুটপাথ নামক পদার্থটি সত্যিকারের কোনও প্রশস্ত বুলেভার্ড নয়। সরু, ইঁট বাঁধানো। দোকান এবং পথের ধারের হকারের ঘিঞ্জি পশরা বিপণনে ক্রমশ সংকীর্ণ এবং সঙ্কুচিত। ফ্রান্সের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে আমার তেমন ধারণা নেই, নগরোন্নয়ন সম্পর্কে তো নেই-ই। এদেশেও কোনও সুভাষ চক্রবর্তী, 'হকার খেদাও' বলে কখনও এঁদের তুলে দিয়েছেন কিনা এবং তাঁরা ফিরে এসেছেন কি না, জানি না। যেভাবে যে কোনও কালস্রোত কিনারা ভূমিতে এসে ফেলে রেখে যায় চিকচিকে পলিমাটির সঞ্চয়।

কলকাতা শহরে আমার ডাক্তাররা, যাঁরা অনেক বলে কয়ে, কাকুতি, মিনতি, অনুরোধ, উপরোধ করেও আমাকে দিয়ে হাঁটাতে পারেননি কোনওদিন টানা কুড়ি মিনিটের বেশি, তাঁদের প্রীত্যর্থে বলি, কান শহরে আমার আর বুম্বার নিয়মিত হাঁটার সময়সীমা কম করেও প্রাত্যহিকভাবে ছিল ঘণ্টা তিনেক। বুম্বা হাঁটছে অন্য আনন্দে। পথে কেউ ঘিরে ধরার নেই, ছেঁকে ধরার নেই—অটোগ্রাফ চাইবার নেই, ছবি তুলতে চাইবার নেই—হ্যান্ডিক্যামটায় সড়গড় হলে কত সহজেই 'সুপারস্টারের স্বাধীনতা' বলে একটা স্বল্পদৈর্ঘ্য নামিয়ে দেওয়া যেত। আর আমি হাঁটছি যেন নিশিডাকে। পথের ধারের দোকানের সারি কেমন যেন সরে-সরে আমাকে

মরীচিকা ভোলাচ্ছে।

সত্যি! কিছুক্ষণ পর একই দোকানের পুনরাবৃত্তি মনে হয়। কিন্তু একঘেয়ে লাগে না সবসময়ে কারণ এই রোদচশমা জোড়াই এখানে হয়তো দু ইউরো সস্তা। ফলে ইউরোহিসেবিদের কোনও দোকানে থিতু হয়ে শপিং করতে শুরু করার আগে মধ্যবিত্ত বিবেক নড়া ধরে পুরো চত্বরটা ঘুরিয়ে দেয়।

কিনতে গেলে একটা ছুতো লাগে তো! সঙ্গীর কাছে তো বটেই, নিজের কাছেও।

এই দোকানটা আজকেই সেরে নিই বুম্বা, বুঝলি! তাহলে কাল আবার এদিকটাতে আসতে হবে না। আমরা অন্য কোথাও যাব। ঠিক যেন, এই দোকানটা সেরে নেওয়ার জন্য কেউ একটা মাথার দিব্যি দিয়েছিল। 'বাবা, তোমার জন্য কী আনব?' বিকেল চারটের আলোয় দাঁড়িয়ে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমাদের মৃদু আলো জ্বলা খাবারঘরে বাবা একা বসে রাত্তিরের খাবার খাচ্ছে।

'কী আবার আনবে? তুমি কেমন আছ?'

'ভাল আছি বাবা। তোমার শরীর ভাল?'

'তোমাদের ছবি কেমন হল? লোকের ভাল লেগেছে?'

'মনে তো হল। কয়েকটা ফেস্টিভ্যাল ডেকেছে,—রোম, ব্রাসেলস...'

'কবে?'

নিঃসঙ্গ খাবার টেবিলের বিষণ্ণতা কী জানতে চাইল তাহলে?

কত শীঘ্র আবার নতুন বিদেশবিজয়?

না কি, আবার কবে চলে যাবে তুমি?

'অক্টোবর, নভেম্বর নাগাদ। দেখি!'

আমি জানি মা হলেই বলত 'আমায় নিয়ে যাবি তো?'

'তোমায় কী করে নিয়ে যাব!'

'কেন, আমি ঠিক প্লেনে উঠে বসে পড়ব। টিকিট

চাইলে তোকে দেখিয়ে দেব।'

'আহা! প্লেনটা যেন তোমার ছ'নম্বর বাস!'

'লোকে মাকে নিয়ে হজ-এ যায়। তীর্থ করাতে নিয়ে যায়। তাতে কত পুণ্যি হয় জানিস।

'আমার পুণ্যির দরকার নেই।'

যে মানুষটার বিছানা ছেড়ে বাথরুমে যেতে গেলে নার্স এবং আয়া লাগে, তার সঙ্গে এই প্রায় অলীক ঝগড়াটা বহুক্ষণ চলত। প্রায় যেন স্বপ্নচারণের মতো। দু'জনেই জানতাম আমরা—এটা সত্যি আবদার নয়। কিন্তু সত্যিটাকে মেনে নেওয়া এক, আর হজম করে নেওয়া এক—তাহলে তো জীবনটা কনফেশন বক্স ছাড়া আর কিছু হবে না। কল্পনার ঝগড়া কি কম দামি?

দু একটা দোকানে কেনাকাটা হয়েছে। ইতিমধ্যেই দু'জনের দুটো ব্যাগ ছাড়া, হাতে বেশ দু-একটা শপিং ব্যাগ যুক্ত হয়েছে। এবং সেগুলো নিতান্ত কম ভারি নয়। বুম্বা বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। আমাকে অনেকগুলো ব্যাগ, জলের বোতল, দোপাট্টা সব কিছু নিয়ে ঈষৎ নাজেহাল দেখে গম্ভীরভাবে হাত বাড়াল—

—ব্যাগ দুটো দে।

ভাগ্যিস কলকাতা নয়। প্রসেনজিৎকে দিয়ে ব্যাগ বওয়াচ্ছি দেখলে ফ্যান ক্লাব আমাকে আস্ত রাখত!

এবার একটা কিছু খেতে হবে। ম্যাকডোনাল্ডস বহুক্ষণ হজম হয়ে গেছে। বুম্বাকে বলামাত্র হাঁ হাঁ করে উঠল,

—এই তো খেলি।

—এই তো নারে। অনেকক্ষণ খেয়েছি। ঘড়ি দ্যাখ।

ঘড়ি দেখেই আঁতকে উঠল বুম্বা।

—সাড়ে ছ'টা বাজে। কী বোকা** দেশ মাইরি! কিছু বোঝবার উপায় নেই।

রাস্তার ধারের ক্যাফেগুলোতে বেশ ভিড়। প্রবল ক্ষিপ্রতায় ওয়েটার এসে একটা মেনু কার্ড দিয়ে গেল।

ইউরোপের মেনু কার্ড পড়ার দুর্গতি আমার আগে কয়েকবার হয়েছে। অনেকগুলো লম্বা লম্বা বাক্যাংশ, দান্তের কোটেশন বললেও আমি আশ্চর্য হতাম না।

কিন্তু খেতে বসে কী খাচ্ছি, বা কী অর্ডার করব, বুঝতে না পারলে তো মহা সমস্যা। একবার ইতালিতে গিয়ে মনে আছে উঠে গিয়ে আশপাশের টেবিলে কে কী খাচ্ছেন, দেখে নিয়ে তারপর ওয়েটারকে বলতাম 'এটা দিন, সেটা দিন।' বুম্বা দেখতাম সে সবের মধ্যেই গেল না।

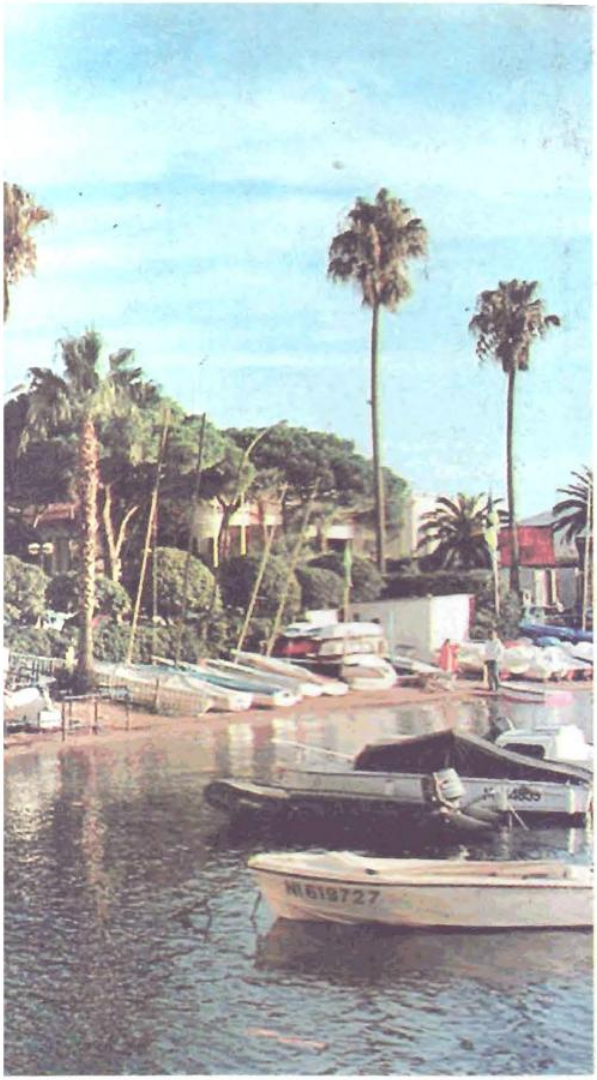

আঙুল তুলে দুই চিহ্ন দেখিয়ে বাংলায় বলল,

—দুটো কফি।

লোনলি প্ল্যানেট-এর শেষের পাতায় কতগুলো অধিক ব্যবহৃত ব্যবহারিক সংলাপাংশ এবং তার ফরাসি অনুবাদ দেওয়া আছে। প্লেনে আসতে আসতে বুম্বাকে বলেছিলাম—এগুলো একবার চোখ বুলিয়ে নে ওরা একদম ইংরিজি বলে না। বুম্বা গম্ভীরভাবে বলল,

—পরে দেখব।

মানেটা বুঝলাম—তুই দ্যাখ। আমার দরকার নেই ওর সত্যিই দরকার নেই। এখানে এসে পৌঁছনো অবধি দিব্যি বাংলায় কথা বলে চালিয়ে যাচ্ছে। আমি আবার ঢং করে কারও সঙ্গে দেখা হলে এক আধবার বঁ জ্যুর (Bon Jour) বলে যে কী ফ্যাসাদে পড়েছি! অমনি তারা গড়গড় করে ফরাসিতে কথা বলে চলে। আমি কী না এটুকু শিখে ফেলেছিলাম যে 'Do you speak English বলতে গেলে 'পার্লে ভু আঙ্গলে' বলতে হয়। তাই অনর্গল ফরাসি শুনলে সেটা বলি, আর তারা আরও গড়গড়িয়ে ফরাসি বলে চলে। ফরাসি মানে আমি যেটুকু বুঝলাম বিবিধভাবে 'শ', 'স', আর 'ষ' বলতে শেখা।

দুটো কফি এল। ছোট্ট দুটো কফি কাপে।

বুম্বা পাতি বাংলায় ওয়েটারকে বলল—

—আর ছোট কাপ নেই?

সে কোনও উত্তর দিল না। প্রবল সবিস্ময় বিরক্তিতে শ্রাগ করে চলে গেল।

বুম্বা রেগে আমায় বলল,

—এক পয়সা টিপস দিবি না।

২

অনেকগুলো ঝোলাঝুলি কাঁখে, কাঁধে হাতে নিয়ে আমি আর বুম্বা ট্যাক্সির লাইনে।

প্রথমত ট্যাক্সির লাইন কোন দিক থেকে শুরু সেটা বুঝতেই কিছুক্ষণ সময় লাগল। স্বাভাবিক! ফুটপাথে জনা আটেক লোক দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দিকে মুখ করে। সারির ডানদিকের লোকটি প্রথম, না বাঁদিকের মহিলাটি প্রথম, ঠাহর করতে না পেরে আমরা ভয়ে ভয়ে লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। একে অপরিচিত, তায় এশিয়ান—মহিলার পাশে গিয়ে দাঁড়ানোমাত্র যদি ফরাসি ভাষায় অপমান করে, আমাদের দাঁত বের করে হাসা ছাড়া কোনও কিছু করার নেই।

দেখলাম, একটা ট্যাক্সি এসে থামল। আমাদের পাশে দাঁড়ানো ভদ্রলোক রেলায় উঠে গিয়ে বসে পড়লেন। বুঝলাম ইনিই লাইনে প্রথম। অগত্যা গুটি গুটি লাইনের অন্য প্রান্তে যাত্রা। সেখানে এসে সেই আগের মহিলার পাশে ভয়ে চার পাঁচ লোক দাঁড়িয়ে। মানে, আমাদের ক্যাবলামোর জন্য শুধু শুধু লাইনে পিছিয়ে গেলাম। বুম্বা আমায় বাংলা ভাষায় কাঁচা খিস্তি করতে লাগল। দোষটা নাকি পুরোপুরি আমার। কী দোষ? না, আমি এর আগে কয়েকবার ইউরোপে এসেছি—অতএব সমস্ত মহাদেশটার জীবনযাপন সংক্রান্ত যাবতীয় প্রকরণবিধি নাকি আমার নখদর্পণে থাকবার কথা ছিল।

মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করবার পর শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সি এল। ট্যাক্সিতে তো চড়লাম—কোথায় যাব বলবটা কী? 'লা বোকা বিচ রিসর্ট'—প্রায় বানান করে বলার মতো করে বললাম। ট্যাক্সিচালক বোধহয় কিছুটা ইংরিজি জানেন—বুঝতে পারলেন। মিনিট দশেক লাগল হোটেলে পৌঁছতে।

আমাদের একটা যুগ্ম তহবিল ছিল রোজকার টুকিটাকি খরচার। সেটা বুম্বার কাছেই থাকত। ট্যাক্সি ভাড়া মেটানোর সময় কানে এল বুম্বা জিজ্ঞেস করছে

—How Much?

ññEighteen.

ññOK. Eighteen rupees.

কী অবলীলায় একটা মানুষ পৃথিবীর অত বিশিষ্ট মহার্ঘ একটা কারেন্সিকে 'রুপি' করে নিয়েছে শুনে হাসিও পেল, ভালও লাগল। সত্যিই তো, বিদেশ বেড়াতে গেলে সারাক্ষণ যদি আমার মধ্যে একটা Conversion Calculator ভরা থাকে, তাতে তো বেড়ানোর মজাটাই মাটি।

ইউরোপ বেড়াতে গেলে এটাই বোধহয় আনন্দের মূলমন্ত্র।

ইউরোকে মনে মনে ভারতীয় রুপি ভাবা।

ঋতুপর্ণ ঘোষ

(চলবে)

# ভাঁ
## ভালো-বাসার বারান্দা

নবনীতা দেবসেন

শব্দের সন্ধানে



**এক একটা শব্দ একা একা সুন্দর, আবার এক একটা শব্দ সঙ্গী পেলে সুন্দর হয়ে ওঠে।** যেমন, যষ্টি কথাটি নিজে তত মিষ্টি নয় তো, একটু কঠিন, কাঠকাঠ, কিন্তু যেই যষ্টিমধু হল, অমনি কত সুস্বাদ! আপনি বলবেন, বাঃ, মধু রয়েছে, মিষ্টি হবে না? কিন্তু মধু থাকলেই কি মিষ্টি হয় নাকি সব কিছু? মধু শব্দটি স্বয়ং এত মধুর, অথচ চক্র শব্দের সঙ্গে জুড়ি বাঁধলেই ব্যস! তেতো, তেতো, তেতো! তা বলে চক্র শব্দ নিজে কিছু ফেলনা নয়, বিষ্ণুর হাতে উঠলে সে পাপ বিনাশী, সুদর্শন। কিন্তু চোর ডাকাতদের পাল্লায় পড়লেই তার কুৎসিৎ মূর্তি! পাপচক্র! পাকেচক্রে ফেলে শব্দ আমাদের বড়ই জব্দ করে।

এ শব্দ সে শব্দ নয়, জজ সাহেবের আইনের আওতার বাইরে এর শয়তানি, ৬৫ ডেসিবেলের চেয়ে অনেক ঘোরতর এর নিঃশব্দ গভীর জটিলতা। আমরা যারা শব্দ চরিয়ে খাই, তাদের কাছে তো বিশেষ করে। শব্দের সন্ধানে কত সময় পার হয়ে চলে যায়, সঠিক শব্দটি পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায় ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে! কিছুতেই এসে ধরা দেয় না জিবের কিংবা নিবের ডগায়। আর আসে না বলে লেখাটি আর শেষ অবধি মনের মতো হয়না, একটা খেদ থেকে যায়, সর্বাঙ্গসুন্দর হলনা। শুধু কি কবিতার বেলায়? কী প্রবন্ধে কী কথাসাহিত্যে, গদ্যেও আমার একই সমস্যা। গদ্যেও (হয়তো আপনারও) মনের ভাব প্রকাশের উপযুক্ত শব্দ জোগাড় করতে আমার অনেক পরিশ্রম হয়। কিছুতেই ঠিকঠাক কথাটা খুঁজে পাইনা। কত যে কাটাকুটি, কত যে কাগজের অপচয়, (আর কাগজের অপচয় মানেই তো অরণ্য সম্পদের অপচয়, লেখকদের এই শব্দ খুঁজে না পাওয়ায় জগতের ক্ষতিটা কি কম?) এই অপচয় বন্ধ করতে কম্পিউটার বড় উপকারী। এই নিরীহ যন্ত্র কিন্তু আপনার-আমার জিগরি দোস্ত হতে পারে। যথার্থ শব্দ না পেয়ে আটকে না থেকে যা মনে এল আপাতত লিখে ফেলে লেখাটাকে চালু রাখলেন, চিহ্নিত করে রাখলেন অপছন্দের শব্দটি, তারপরে ঠিক শব্দ মনে এলে আবার টুক করে বদল করে দিলেন। আমার তো কেবলই কাটাকুটি করা, আর পাতার পর পাতা অপছন্দের লেখা ফেলে দেওয়ার স্বভাব। লেখা আর শেষই হতে চায়না (সুযোগ বুঝে প্রুফেও চলে তথাকথিত উন্নতিসাধনের কারিকুরি, তফাত হয়তো কিছুই হয়না)। কানাই লক্ষ্মী ছেলে, বেশি বেশি কাগজ ঝুড়িতে ফেললে, সেই ফেলে দেওয়া কাগজের বান্ডিল বানিয়ে সে ওর হিসাবের খাতা করে ফেলত। কম্পিউটারের দৌলতে তার এই সুবিধেটা গত হয়েছে কয়েক বছর। তবে যন্তর তো, মানুষের সঙ্গে পারবে কেন? বাংলায় একটানা লেখার সময় সাহেবের বাচ্চা কম্পিউটার বাবাজীবন একেবারে বমকে যান। ভ্রম সংশোধনের আশা ভরসা ত্যাগ করে, হাল ছেড়ে দিয়ে সবিনয়ে নোটিশ দিয়ে জানান, আপনার লেখাটির মধ্যে অগণিত ভুল বানানের শব্দ ভর্তি। কী মশাই, কিছু করুন?

আর ইংরেজিতে লেখার সময়ে আবার আপনার বশংবদ কম্পিউটারের অন্য মূর্তি। নিজেকে আপনার চেয়ে ঢের স্মার্ট আর সবজান্তা ভাবেন। কনফিডেন্টলি পাকামো করে সেধে সেধে ওঁর নিজের মনের মতো শব্দ আগে ভাগেই আপনাকে সাপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করেন। ভারি বিরক্তি হয়। ওটার হাবভাবে মাঝেমাঝে আমার মনে হয়, কম্পিউটারে যেমন দাবা, তাস, ওয়র্ড মেকিং, এবং আরও একশোটা খেলা, খেলা যায়, তেমনি শব্দ সন্ধানও খেলা যায় কি? যাবেনা কেন? সফ্টওয়্যার বানালেই হল।

তবে আজকাল নাকি অল্পবয়সীদের মধ্যে ক্রস ওয়ার্ড পাজল আর তেমন জনপ্রিয় নেই, তাদের মন কেড়েছে সু ডো কু। জাপান থেকে আমদানি করা আধুনিক সংখ্যার খেলা। কম্পিউটারে নিশ্চয়ই সু ডো কু খেলা যাবে। বিলেত থেকে আমদানি সেই ঔপনিবেশিক যুগের শব্দের খেলাতে এখন মন লাগে না তরুণ প্রজন্মের, ওই নয় কামরার সংখ্যার খেলার জটিল চ্যালেঞ্জ চোখ টেনে নিয়েছে তাদের। অনেক কাগজেই শব্দ-সন্ধানের সঙ্গে ইদানিং সু ডো কু ছকও থাকে, আলাদা আলাদা প্রজন্মের জন্যে। সংখ্যার ভাবনার জন্য অন্য এক ধরনের বুদ্ধি লাগে। শব্দ খুঁজতে আর এক জাতের বোধ কাজ করে। দুটো দু-রকমের চ্যালেঞ্জ, একই ধরণের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে না হয়তো। শব্দের মায়া ক্রমশ পুরনো হয়ে যাচ্ছে, নতুন পৃথিবীতে এসএমএস-এর সংক্ষিপ্তসার ভাষাই মানুষের প্রয়োজন মেটানোর অভ্যেস দাঁড়িয়ে যাবে বলে ভয় করছে

আমার।

এই প্রসঙ্গে আমার বাবার কথা মনে পড়ল। অল্পবয়সী বাঙালিরা অনেকেই হয়তো জানেন না যে শব্দ-সন্ধান এই সুন্দর, সর্বদা ব্যবহৃত শব্দটি কবি নরেন্দ্রদেবের সৃষ্টি। একদা তাঁর সম্পাদিত ছোটদের পত্রিকা পাঠশালাতে তিনি প্রতি মাসে ছোটদের জন্য ধাঁধাঁ দিতেন এবং শব্দ সন্ধান-এর ছক তৈরি করে দিতেন। দশটি ভুল করলে উত্তরদাতার নাম ছাপা যেত না বটে, কিন্তু বালক বালিকাদের উৎসাহ দিতে নাকি ন'টি ভুল পর্যন্ত উত্তরদাতাদের নাম পত্রিকাতে প্রকাশিত হত। স্বর্গত সন্তোষ কুমার ঘোষ আমাকে বলেছিলেন তিনি নিজের নাম প্রথম ছাপার হরফে দেখেছিলেন ওই পাঠশালায় শব্দ-সন্ধানের জন্য তাঁর নাম বেরিয়েছিল খুব ছোটবেলাতে। শব্দ সন্ধান দিয়ে শুরু করে, সারাটা জীবনই তাঁরা নিবেদন করেছেন শব্দের পায়ে।

শব্দের নেশা বড় ভয়ানক নেশা। কবিদের শব্দ ভাবনা তো গেল এক রকমের প্রয়োজন, তাদের আত্ম অনুসন্ধানের, নিজেকে বোঝবার এবং বোঝাবার অনিবার্য সহায়ক। কিন্তু যারা লেখালেখির মধ্যে নেই অথচ শব্দ নিয়ে পাগল, তাদের কী বলব? সংখ্যায় তারা হয়তো আরও বেশি। আমার প্রিয় দিদিভাই-এর বয়স আশি ছুঁই ছুঁই, না বলে দিলে অবশ্য বোঝবার উপায় নেই, দেখলে ভাববেন বুঝি আমার ছোট বোন। চারখানা বাংলা কাগজ রাখেন, শুধু শব্দ সন্ধানের নেশায়। এই নেশাই দিদিভাইকে অল্পবয়সী রেখেছে। তাঁর মস্তিষ্ক সদা সর্বদা একটা সুস্থ চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছে, লড়কে লেঙ্গে শব্দস্থান! এই নিয়মিত একমনে মগজ খেলানোর অভ্যাসটি ভয়াবহ আলজাইমারস রোগের একমাত্র এবং অব্যর্থ নিরোধক বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রবন্ধে পড়েছি। প্রত্যহ মনোনিবেশ করে শব্দের ধাঁধার উত্তর খুঁজলে ঢের বয়স হয়েছে বাবা, এবারে হাল ছেড়ে দিয়ে আরাম করি, এই অজুহাতে মস্তিষ্কের কোষগুলো আর আলস্যের মধ্যে নিজেদের এলিয়ে দিতে পারে না, তাদের চাবুক মেরে রেসের ঘোড়ার মতো নিয়মিত দৌড় করান দিদিভাই, তাঁর প্রাত্যহিক শব্দসন্ধানের কল্যাণে।

সকালে উঠেই তিনজনের নেটওয়ার্কিং শুরু হয়, দিদিভাই, আরেক শব্দ-নেশাতু ফ্রেন্ড সৌম্য, আর শ্রাবন্তীর। আচ্ছা, সৌম্য, তা দিয়ে শুরু পদ্মের কোনও প্রতিশব্দ জানিস? কী রে? বুলবুলিমাসি, পুরাণে উল্লিখিত প্রথম নারীর নাম কী ছিল গো? হ্যাঁ রে, শ্রাবন্তী, আজ প্রতিদিনটা পেরেছিস? সাত পাশাপাশি আনন্দবাজার? আমি গতকালকের তিন নম্বর ওপর নিচেটা পারিনি। ওঃ ওইটে? ওইটে খুব বিশ্রী, কেউ পারেনি। ওটা হয়না। দাঁত মাজার পাঁচ অক্ষরের শব্দ, দ দিয়ে শুরু, ন দিয়ে শেষ হতে হবে। না না, দন্তমার্জন চলবে না, র্জ টা অসুবিধে করছিল। আজ লিখেছে দন্তধাবন। ভেবে দ্যাখ একবার? ওঃ, যা খুশি একটা বানিয়ে বানিয়ে বললেই হল? সকাল থেকে ফোনে উত্তেজিত আলোচনা চলে জীবনের এই সব গুরুতর সমস্যা নিয়ে। শ্রাবন্তী মধ্য বিশ, দিদি প্রায় আশি, কিন্তু শব্দজব্দের আলোচনার সময়ে মাঝখানের অর্ধশতাব্দী ফুসমন্তরে উপে যায়, তখন মাসি বোনঝি দু'জনের বয়েসে একটুও তফাৎ নেই।

ওরা বলে এই বিষয়ে আমার নাকি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। একই কাজের কারণে দিদিভাইকে রবার্ট ব্রুস বলে বাহবা দিই তাঁর অক্লান্ত ধৈর্যের জন্যে, আর শ্রাবন্তীর বেলাতে খালি বাগড়া দিই অকম্মার ধাড়ি বলে। সকাল থেকে এই ধাঁধাঁ মুখে করে পড়ে আছিস, হ্যাঁ রে, তোদের বুঝি কোনও কাজকম্মো নেই? আগে ভাবতুম শব্দছক শুধু ভাষা শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রী, অবসরপ্রাপ্ত, বেকার, এবং ডেলি প্যাসেঞ্জারদের জন্য, টাইমপাস করার নিরীহ উপায়। এদের দেখে বুঝি তা নয়। মদ, সিগারেটের মতোই স্মৃতি হাৎড়ে হাৎড়ে শব্দ খুঁজে বেড়ানো এক সর্বোনেশে কর্মনাশা নেশা! এরা তো বেকার নয়, জরুরি কাজ ফেলে রেখে, সমাজ সংসার মিছে সব বলে শব্দ সন্ধান নিয়ে পড়ে থাকে। এখন মনে হয় হাতে একটু অবসর থাকলে সমাজ সংসারের পক্ষে হয়তো খেলাটা বেশ ভালই। একটা কলম ছাড়া কোনও উপকরণ লাগে না, সঙ্গীও লাগে না, দিব্যি একা একা খেলা যায়, মাথাটা চালু থাকে, মনঃসংযোগ অভ্যেস হয়, স্মৃতিশক্তি বাড়ে, ভোকাবুলারি বাড়ে, ভাষাটাও রপ্ত হয়। উপরি প্রাপ্তি, কু-চিন্তার অবসর কমে যায়। পি এন পি সি, কী টিভি সিরিয়াল দেখার চেয়ে তো ভাল? বুদ্ধির ব্যায়াম হয়, লেগে থাকার অভ্যাস হয়, চ্যালেঞ্জ নেবার সাহস হয়, মন্দ কী? শব্দছক করতে করতেই হয়তো এরা ছক করতে শিখে যাবে একদিন। ছক করা কি সোজা কম্মো? বেসিকসটা শিখে রাখলে কাজে লাগবে, কী দিদিভাই-এর, কী শ্রাবন্তীর।

এই ছকুদের ভুবনে তো দেখছি ছকের প্রয়োজনীয়তা ফুরোয় না।

২৩.০৬.০৭

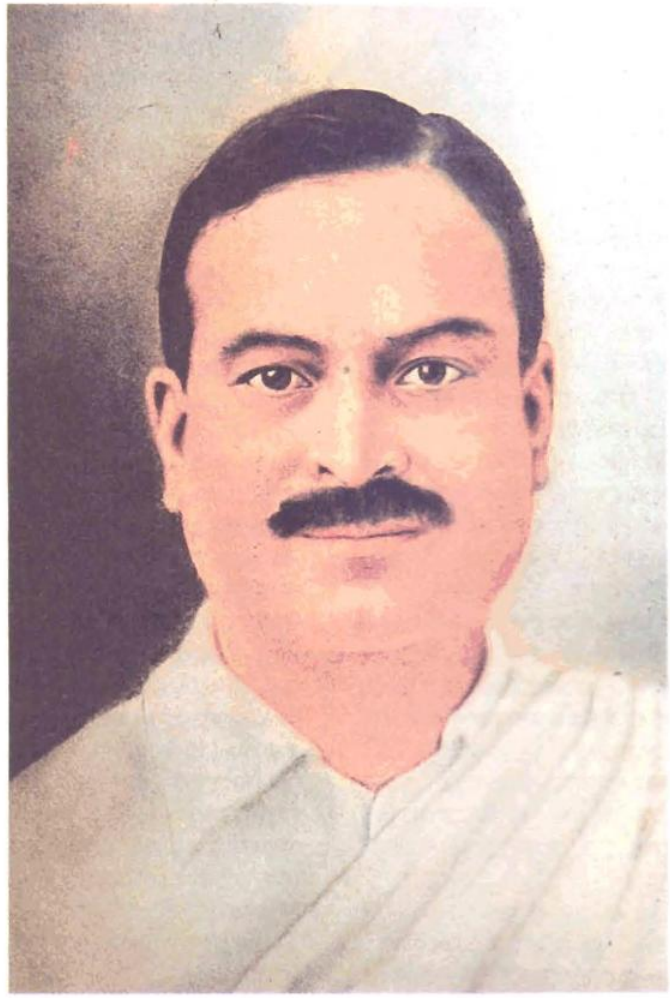

# বিধির বিধান

বাঙালির বিধান তিনিই দিয়েছেন অহরহ। রাজ্যের অসুখ সামলেছেন। কখনও ডাক্তার হিসাবে, কখনও বা মুখ্যমন্ত্রী। ওই অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের এক সম্পূর্ণ অচেনা ছবি আঁকলেন শ্রী নিরপেক্ষ

**যেদিন ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ পদত্যাগ করলেন, সেদিন সেযুগের নিষ্ঠাবান সাহেবি কাগজ, স্টেটসম্যান তার প্রথম সম্পাদকীয়র শিরোনামে লিখেছিল, 'চলে গেলেন একটি ভাল লোক'।** যদিও খবরটা আমরা জানতাম আগের দিনই, কয়লার ইঞ্জিনে-টানা বারুইপুর-শিয়ালদহ ট্রেনে বসে যখন ওই হেডিংটা দেখলাম, চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল।

ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক, উভয় বিচারেই ঠিক তার উল্টো চিত্র দেখা গেল শিয়ালদহ-বারাসত লোকাল ট্রেনে। ডেইলি প্যাসেঞ্জারেরা মুচকি হাসত, যখন কামরার ফিরিওয়ালা পাঁচালির সুরে আরম্ভ করত 'মসনদে এল নলিনী বিধান। বাঙলার নারী হও সাবধান।' ১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি, তাঁর শপথ গ্রহণের দিন থেকে মাসের পর মাস অনুক্রমণিকা হিসাবে ক্রমাগত এই পাঁচালি গাওয়া হত, দাঁতের মাজন এবং ডালমুট-ঝালমুড়ির হকারদের অবিস্মরণীয় সুরেলা গলায়। শ্রোতাদের চার-আনা ছয়-আনা অংশে কথাটায় সে আমলই দিত না, তা বলা যায় না। বাকিরা গানটিকে নিত নির্দোষ কৌতুক হিসাবে। কিন্তু বিধানবাবুর ভক্তদের কোনওদিন দেখিনি কাছে ভিতে, কেউ উঠে ওই অশালীন গায়কের গলা টিপে ধরেছে। ভক্ত, উপাসক, দলের লোক এসব কি তাঁর ছিল কেউ? ওই গীতি-মস্করার প্রতিবাদ যে ওঠেনি, তার একটা কারণ আমি তখন ভাবতাম, হয়ত কথাটা ঐতিহাসিক দিক থেকে সত্যও ছিল, সদ্য স্বাধীনতা লড়কে-নেওয়া-দেশে যে প্রকারের গণভিত্তিক জনপ্রিয়, জেল-খাটা, নির্ধন একটি মানুষকে বাঙালি আশা করেছিল তাদের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পাবে, অঙ্গের আভা হিসাবে বিধানবাবুর মধ্যে তার এক বিন্দুও ছিল বলে সেকালে আমাদের মনে হয়নি।

লোকে তাঁকে চিনত না বললে ভুল বলা হবে। তাঁকে অবশ্যই সর্বদা দেখা যেত, পীড়াগ্রস্ত কংগ্রেস নেতাদের শয্যাপার্শ্বে অনশন ভঙ্গ করার সময়। অথবা, অনশন সত্যাগ্রহের সঙ্কট-সপ্তাহে তো বটেই, গান্ধীজির পাশে। দেখা যেত, ভারতবর্ষের প্রথম বেসরকারি এয়ার লাইনস-এর প্রতিষ্ঠাতা-মালিক, ডাক পড়লেই উড়ে যাচ্ছেন হিল্লি দিল্লি বোম্বাই। বড় লোক, যেমন বিড়লা-টাটা-মফৎলাল, কিংবা বড় মানুষ যেমন, গান্ধী, মালব্যজি, মাতা সরোজিনী, কন্যা পদ্মজা নাইডু প্রভৃতি রোগী দেখতে। তাঁর ছিল নিখিল ভারতীয় পসার, ভারতবর্ষে প্রথম এবং অদ্বিতীয়।

তখনকার দিনের দৈনিক-পড়া বাঙালিরা এসব দেখত, জানত। তাঁকে যে জেলখাটা সংগ্রামীরাও ডাকছে, উনি যে শুধুই সাহেবদের নাড়ি টিপে বেড়াচ্ছেন না, এতে তাঁর সম্বন্ধে মানুষের সমীহা ছিল আসাধারণ। উনি দরিদ্রবান্ধব, এটাও লোকে বিশ্বাস করত। কোলে কাঁখে রোগী নিয়ে তাঁর ওয়েলিংটন স্কোয়্যারের বাড়ির পিছনের দিকের একটা ঘরে মানুষ ভিড় করত। সকালের অন্য কাজ শুরু করার আগে ৫০-৬০ থেকে ১০০ খানেক রোগী দেখতেন তিনি, শুনেছি আধ ঘণ্টার মধ্যে। ওটাও তাঁর কিংবদন্তী লতার একটি গুল্ম। উনি নাকি ঘরের একপ্রান্ত থেকে রোগী দেখে হেঁড়ে গলায় একটি বিশেষ নিনাদে তাঁর কম্পাউন্ডার বাবুকে বলতেন, 'ওই ওষুধটা চারদিন বারো মাত্রা'।

জনসভায়

সেটা আর বড় কথা কী? লোকে বলত, বিধান রায়কে ধরলে তিনি কেওড়াতলা থেকেও রোগীকে হাঁটিয়ে বাড়ি নিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু সে তো অন্য কথা, তিনি জেলে যাননি, জনসভায় বক্তৃতা করেননি, স্বাধীনতার আধ বছর ঘুরতে না ঘুরতে তিনি নলিনী সরকারকে অর্থমন্ত্রী বানাচ্ছেন, এমন কাণ্ড লোকে মুখ বুজে মেনে নেবে?

ছড়া বানিয়ে রেলের কামরায় গলা ফাটাবে না? বললেই হল? তদুপরি, নলিনীবাবুর গায় তখনও দুর্গন্ধ আতরের মতো লেগে ছিল। (বদ বুঁ-ওলা আতর আদৌ হয় কি না তা হলফ করে বলতে পারব না) বীণা সরকারের রহস্যজনক মৃত্যুর সুদীর্ঘ আদালতি রিপোর্ট তখনও বাঙালির স্মৃতিতে জাগর। সেটি অবলম্বন করেই কলকাতার একটি দৈনিকের বৃহত্তম প্রচার সংখ্যার জন্ম। তখনও বৈঠকখানায় হুঁকো হাতে লোকেরা, আচারের মতো চেটে চেটে খাওয়া যায় এমন আর কোনও দ্বিতীয় বিষয় পায়নি। 'পাকুরের' মামলাটা অল্পে থিতিয়ে গেছে। 'ভাওয়ালের সন্ন্যাসী' প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে আপাতত জল্পনা কম, কেননা বিষয়টা বোধ করি তখন দীর্ঘসূত্রী হয়ে প্রিভি কাউন্সিলে ঝুলছে। এক অপরকে ফিসফিসানি দূরত্বে পেলেই চেপে ধরে প্রশ্ন তুলত, 'বলো তো ভায়া। তোমার কী মনে হয়?'

'নলিনীবাবুর সত্যিকারের ভাইঝি ছিল কি বীণা সরকার? নাকি, ডাকতো ওঁকে কাকাবাবু বলে? হ্যাঁ কী? বল না হে? তোমরা তো খবরের কাগজে কাজ কর।'

বাঙালির কেচ্ছামাখা আচারের তৃষ্ণা থেকে কোনও নামকরা লোক ছাড়া পেয়েছেন বলে জানি না। সুভাষবাবু, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দ, কেউ কেচ্ছা-মন্থন থেকে বাদ গেছেন বলে তো জানি না। নলিনীবাবুর ব্যাপারটার সত্যাসত্যও জানা হয়নি, কিন্তু বিধানবাবু যখন মন্ত্রিসভায় নলিনীকে তুলে আনলেন, তার মধ্যে বিধান রায়ের একটা বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল। তাঁর মধ্যে ছিল না নেহরু, কৃপালনি, অরুণা আশরফ আলির মতো অচিহ্নিত অঙ্গের আভা, যাকে বলা হয় ক্যারিশমা। শুধু তাই নয়, তার জন্য বিধানবাবুর ছিল না কোনও

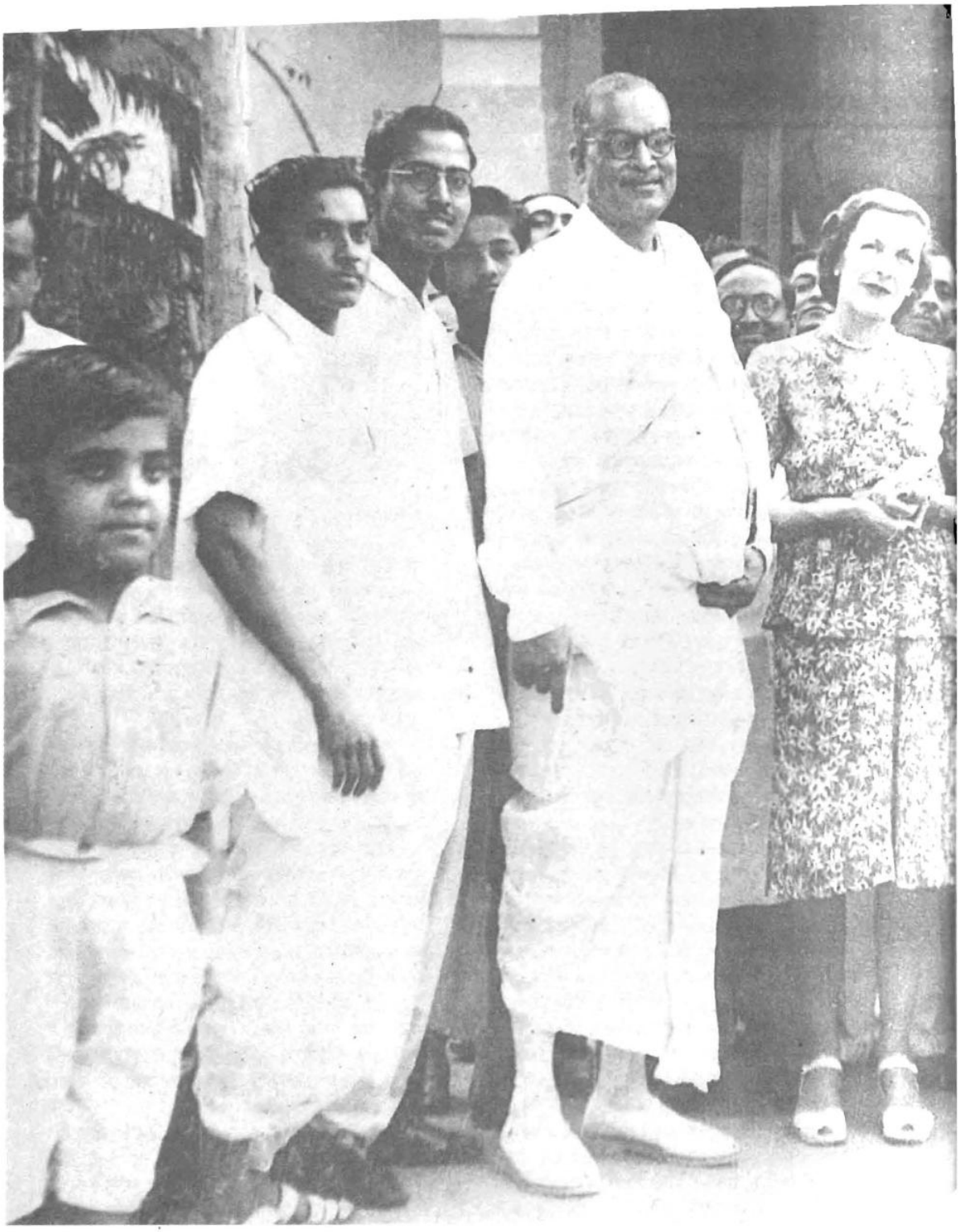

লেডি মাউন্টব্যাটেন-এর সঙ্গে

পরোয়া। আর, প্রেস গ্যালারিতে আমাদের ছিল সেইটাই সব চেয়ে বড় গায়ের জ্বালা।

রেলের কামরার ছড়া এবং সেইসব ছড়ার ছাপানো সংস্করণ জমিয়ে রাখলে এই 'রোববার' কাগজকে পাঠিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আমার আবার মহাফেজ বানানোর বাতিক নেই। আর একটা ছবি মনে আসছে, গল্পটা বিধানসভায় অর্থমন্ত্রীর আফিস ঘরে বসে শোনা। তখন নলিনীবাবু প্রবল মধুমেহ রোগে ভুগে একাবারে কৃশকায়। তাঁর গৌরবর্ণে আস্তাচলের রংটুকু শুধু আলতো হয়ে লেগে আছে। আর আছে মার্জিত মানুষের হাস্যরসবোধ।

বললেন, কিরণবাবুর শবদেহটা যখন শোভাযাত্রার মাথায় করে নিয়ে এল ওয়েলিংটন স্কোয়্যারে, সে কী

কাতারে কাতারে লোক! বিধানবাবুর বাড়ি থেকে শেষ মাথাটা গিয়ে ঠেকেছে বোধকরি রিপন স্কোয়্যারে। ওঁর বাড়ির জানালার তলায় যে ছোট গোল বারান্দা আছে, তার একটিতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বিধানবাবু এবং নলিনীবাবু ওই শোকযাত্রাটি দেখছিলেন। নলিনীবাবু বললেন, 'স্যর, আমি আপনি মরলে, কি এর এক কণা লোকও হবে মনে করেন? দেখে নেবেন, আমাদের জন্য একটা লোকও রাস্তায় বেরবে না।'

বিধানবাবু আশ্বাসের সুরে বলেছিলেন, 'না হে না, ও নিয়ে দুঃখ কোরো না। লোকের ভিড় যদি বলো তো, রাস্তা ঘাটে ধরে না এমন লোক বেরিয়ে আসবে। সবার মুখে এক কথা 'চল, চল। দেখে আসি, সত্যি সত্যি

ডাক্তারবাবুর বাড়ি, এখন

লোকটা মরেছে কিনা।'

সেজন্য অবশ্যই নয়, কিন্তু ১৯৬২ সালের ১ জুলাই জমাট জনতায় রানি রাসমণি রোড থেকে ধর্মতলা স্ট্রিট কীভাবে মানুষের দেয়ালে গেঁথে গিয়েছিল একটা নিরেট ব্যারিকেড, সে দৃশ্যটি বন্ধুবর সুদেব রায়চৌধুরি দেখেছিলেন স্বচক্ষে। সেদিন পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর লুবচেকের সংবর্ধনার বিবরণ লিখবার জন্য নবীন রিপোর্টার সে গিয়েছিল করপোরেশন বিল্ডিং-এ। সেখানে খবরটা পাওয়ামাত্র, দৌড় দৌড়। সম্বল শুধু কনুই আর একটা রিপোর্টারের নোটবুক। লোক গুঁতিয়ে, ধাক্কিয়ে, ভেঙে সেই দুর্জয় রিপোর্টার যখন পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ওয়েলিংটন স্কোয়্যারের তিনতলা, বারান্দা-ঝোলানো বাড়িটার সামনে এল, ততক্ষণে আরও গণ্যমান্যদের মধ্যে দীর্ঘকায় সত্যজিৎ রায় লোহার গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে। ভিড়ের চাপে সে গেট খোলার উপায় ছিল না। অবশেষে সে চেষ্টা পরিত্যাগ করে ভিতর থেকে কে একজন পরামর্শ দিলেন, বড় লোহার পাল্লার গেটটার তলায় মালপত্র ডেলিভারির জন্য যে খিড়কিটা থাকে সত্যজিৎবাবুকে তার ভিতর দিয়ে গলিয়ে আনো। তাই করতে হয়েছিল এবং সে লম্বা মানুষটাকে হামা দিয়ে পরলোকগত পৃষ্ঠপোষকের বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করতে হল।

মাত্র চোদ্দো বছরে একটা লোক সম্বন্ধে মানুষের মমতার নির্ঝরিণী কীভাবে পর্বত কন্দর ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে, তার দুর্লভ দৃষ্টান্ত বিধান রায়। যদিও ছিলেন রাজনীতির মসনদে, গণদেবতার ধার ধারেননি কোনওদিন। আসলে মানুষটি ছিলেন আপাদমস্তক টেকনোক্র্যাট। প্রকাণ্ড সিইও। দুর্ভাগা পশ্চিমবঙ্গ তাঁকে চিনল চোদ্দো বছরে। হা হতোস্মি, আমার এই টেকনোক্র্যাট কথাটা মাথায় ঢুকতে লাগল তার দ্বিগুণ, আঠাশ বছর।

এর মধ্যে, মনে রাখতে হবে, একবার ট্রামভাড়া বৃদ্ধি বন্ধ করার দাবিতে এলগিন রোড থেকে পূর্ণ সিনেমা পর্যন্ত ট্রামের লোহার রেল লোকেরা উপড়ে দিয়েছিল। একটা আগুনের সুরঙ্গ দেখেছিলাম, যেমন দেখি যুদ্ধের দৃশ্যে সিনেমায়। তারপর খাদ্য আন্দোলনের বিভীষিকা এবং সিদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগ। এমন ঝঞ্ঝা নেই যা এই ব্যূঢ়োস্কন্ধ আজানুলম্বিত বাহু মানুষটিকে এসে ঝাঁকায়নি।

জ্যোতিবাবুর মতো একেবারে রবীন্দ্রনাথ পড়েননি, এমন নয়। কিন্তু আধাখানা পংক্তিও বিধানচন্দ্র কোনওদিন আওড়াতে পারেননি। আবৃত্তি করলে তাঁর ওই পাটনাই-বাংলায় হেঁড়ে গলায় রবি ঠাকুরকে কেমন শোনাত সেই অভিজ্ঞতাটুকু আদায় করা হল না। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অতি সুগ্রথিত ইংরাজি যেমন ঢাকা-বিক্রমপুরের ইনটোনেশানটি কোনওদিন পরিত্যাগ করতে পারল না গান্ধী, মওলানা আজাদ, জহরলাল, রাজগোপালাচারির সঙ্গে এক দশকেরও বেশি ওয়ার্কিং কমিটির আদবকায়দা আয়ত্ত করা সত্ত্বেও। বিধানবাবুরও তেমনি বিলেতে পড়া, কথায়-কথায় চিকিচ্ছে করানোর জন্য ভেনিস চলে যাওয়া, এসব সত্ত্বেও তাঁর বাংলা উচ্চারণ থেকে গেল না বিহারি মৌলিকতা। যেমন তাঁর তথাকথিত 'পাঞ্জাবি'—শার্ট এবং পাঞ্জাবির ফিউশনে তৈরি—ভাষাও ছিল সেইরূপই ফিউশনে বিধৃত। 'চিন্তা করে দেখছি—দেখব', এসব কথায় অনায়াসে তিনি বলতেন

'ধ্যান করছি', 'ধ্যান করতে হবে'। এর থেকেই অনুমান করা যায়, কেন তিনি বঙ্গবিহার মিলিত একটি রাজ্য তৈরি করার স্বপ্নে মেতেছিলেন।

স্বপ্ন তাঁর ছিল অভ্যাসের ব্যাপার, অথবা মুদ্রাদোষ। সল্টলেক, কল্যাণী, হরিণঘাটা, এসবকে উনি বলতেন, বাঙ্গলার 'রূঢ়'। উদীয়মান দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা, বিদ্যুৎ প্রজনন কেন্দ্র, পিলকনটন গ্লাস ইত্যাদির দিকে তাকিয়ে, ভারী এবং বৃহৎ শিল্প, দামোদর বাঁধ ও তার অববাহিকায় চিমনি-তোলা কারখানার স্বপ্নে তিনি দেখতেন জার্মানির মতো বাউন্ডার শিল্পের পেশি।

কিন্তু বিহারি মৌলিকতার সঙ্গে, আরও মূলে, ছিল তাঁর কায়কল্প, ব্রাহ্ম সৌজন্য ও বিশুদ্ধতা। তারই জন্য প্রেমকে সারা জীবন জাগিয়ে রেখেছিলেন একটি প্রদীপের মতো। বাঙালিরা তাঁর ওই কৈশোর প্রেমিকাকে নিয়ে গল্প বানানোর অস্ত রাখেনি। বিধানবাবু বস্তুর সম্পর্কেই শুধু বাঙালি। না চিন্তায়, না ধ্যানে, না বৃত্তিগত উৎকর্ষে; বছর কুড়ি আগে সল্টলেকে কলকাতার ডেভলপমেন্ট কনসালটেন্ট নামক কোম্পানিটির প্রতিষ্ঠাতা-মালিক সাধন দত্ত মশাই একটা উপযুক্ত প্রস্তর মূর্তি স্থাপন করে জ্যোতিবাবুকে ডেকেছিলেন তার উদ্বোধন করার জন্য। সেখানে আমি কাঁটা হয়ে ছিলাম, কী অপ্রস্তুতি না জানি বেরোবে আজ এই বিলেত-ফেরত, বিপ্লবী নয়া মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে। কিন্তু জ্যোতিবাবু সে সভায় বিরোধি দলনেতা হিসাবে প্রাপ্যের অতিরিক্ত কী কী সৌজন্য পেয়েছিলেন, তাঁর পিতৃবন্ধু বিধানবাবুর কাছ থেকে, তার বর্ণনায় অনেকটা সময় নিয়ে ঘটির পর ঘটি ভর্তি স্মৃতির স্নিগ্ধ জল গায় ঢেলে যখন অবগাহন করতে আরম্ভ করলেন, তখন আমি তো তাজ্জব। সেই আমি, যে তাঁকে দেখেছিল উদ্ধত অসৌজন্যের চাবুকের মতো, বুঝতে পারলাম, এই পার্টিতে আর কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই—বিমানবাবুর কথা তো উঠতেই পারে না—ইংরাজি জানা, কইনেওলা কারাত-ইয়েচুরিও পরিষদীয় রাজনীতির অন্তরের গহন দ্বারে কান পেতে শোনেনি, শুনবেও না, বিধানবাবুর আমলে রাজনীতির মধ্যে যে মমতাময় প্রতিবাদের আওয়াজ ছিল, জ্যোতিবাবু যেমন সে আওয়াজ শুনেছেন।

তাঁর এসেম্বলির অফিস ঘরে কী একটা উত্তপ্ত বিষয়ে জ্যোতি বসু গিয়েছিলেন উদ্ধত প্রতিবাদ জানাবার জন্য। তাঁর ডান হাতের দিকে এক নজর তাকিয়েই বিধান রায়, একটা প্রেসক্রিপশন ঝাড়লেন। লোককথায় বলে, মাতৃগর্ভ থেকে তিনি বেরিয়েছিলেন কালো আলখাল্লা পরনে, হাতে এমবিবিএল-আর-এমারসিপির দুইটি পাকানো সনদপত্র নিয়ে।

রোববার পত্রিকাটির 'ফার্স্ট পার্সনটি' যেমন নির্বিচার সৌহার্দে বালকবৃদ্ধ সকলকেই সেকেন্ড পার্সনে পরিণত করেন, বিধানবাবু বঙ্গসমাজে তেমনি এই অনাদৃত আত্মীয়তার পথপ্রদর্শক। গুরুজন ইতরজন নির্বিশেষ তাদের সকলকে 'তুমি' সম্বোধন করা এবং উপরন্তু নাম গুলিয়ে লোককে ডাকা—তারাশঙ্করকে চিরকাল তারানাথ সম্বোধন, শঙ্করদাসকে শঙ্করচন্দ্র ইত্যাদি বেখেয়ালিপনায় আমাদের হাসিয়ে এবং সম্বোধিতকে বিব্রত করে গেছেন।

আমার কলম যখনই বিধানসভার পার্শ্ব চরিত্র রচনা করত, তাতে থাকত এক অবাঙালিসুলভ দীর্ঘকায়, আধা-হিন্দিভাষী, আধা-শার্ট-আধা-পাঞ্জাবি পরিহিত অহঙ্কারী আধা-ভিকটেটরের এক চিত্র। একবার সেই চিত্র পড়ে, ট্রাম ভাড়াবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের সময়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন তাঁর অবিস্মরণীয় সম্পাদকীয়র শিরোনাম : 'বাংলাদেশের জ্যেঠামশাই।'

সেই জ্যেঠামশাই একদিন ডিভিশন বেল বাজার পর প্রেস গ্যালারির পাশ দিয়ে বাইরে যাওয়ার সময় বললেন, 'কলমে তো বিষ ভরে রেখেছ, পেটের অ্যামেবায়োসিসটার চিকিৎসা করাও দেখি একটু। বাড়ি থেকে বেরবার আগে পকেটে একটা কড়াপাকের সন্দেশ নিয়ে বেরিও, বেশিক্ষণ খালি পেটে থাকতে নেই।' প্রেস গ্যালারির অন্য রিপোর্টার-সহ আমি তো হতবাক।

বিধান রায় আজীবন অকৃতদার থেকে গেলেন কেন, সে বিষয়ে মধুর-কষায় অনেক কাহিনি যাঁকে নিয়ে, সেই বিগত-প্রৌঢ়া সস্নেহে এক বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় আমাকে তাঁর আলয়ে ডাকার সময় সাবধান করে দিয়েছিলেন, 'তোমাদের মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন কিন্তু, আপত্তি নেই তো?' তখনও সেই ষাট পেরিয়ে যাওয়া, টাঙ্গাইলের শাড়ির একটুখানি আঁচল মাথায় টানা সিঁথির মুখটাতে সিঁদুরের বড় টিপের তলায় কয়েকটি পাকা চুল উড়ছে। তন্বী শ্যামলা দীর্ঘাঙ্গিনীকে দেখলে বোঝা যেত, এইরকম এক লাবণ্যর জন্যই একটা সুন্দর অকৃতদার মানুষ সারাটা জীবন উপবাস-দীক্ষায় যাপন করে দিতে পারে।

লেখক ম্যাগসেসে সম্মানপ্রাপ্ত সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরি

বি
বিধির
বিধান

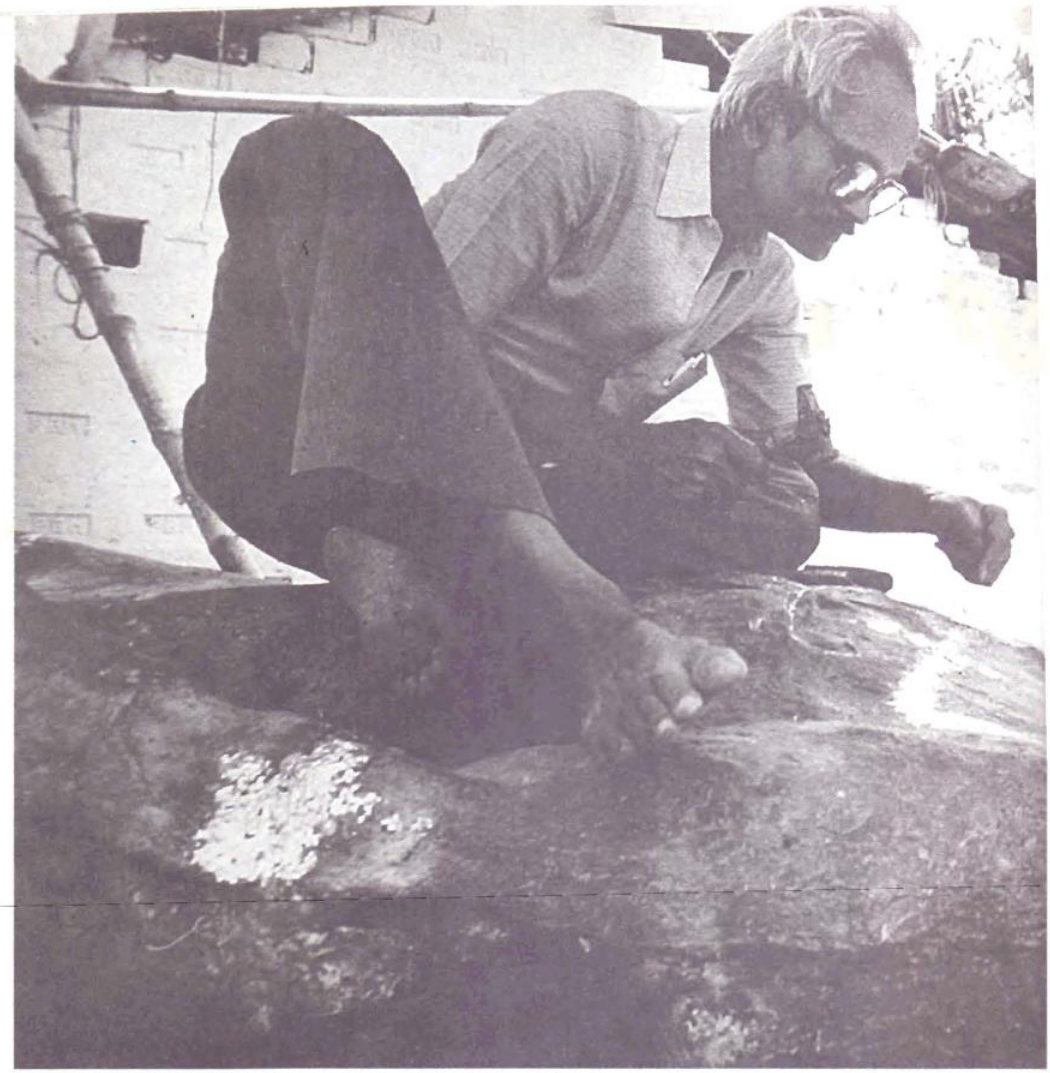

বিধানচন্দ্র রায়ের মূর্তি তৈরির কাজে ব্যস্ত ভাস্কর দেবব্রত চক্রবর্তী

# রয়াল হাইনেস

'রয়' বংশজাত, তাই রয়াল।
উচ্চতায় ছয় ফুট চার,
তাই তাঁর হাইনেস নিয়েও
কোনও সংশয় নেই আমবাঙালির।
শংকর ঘোষ

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

**চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি যখন ভারতের শেষ গভর্নর জেনেরাল নিযুক্ত হলেন তখনও এদেশ পূর্ণ স্বাধীন হয়নি।** ভারত ও পাকিস্তানের ডমিনিয়ন স্টেটাস চলছে। তাই রাজাগোপালাচারির গভর্নর জেনারেলের পদে নিয়োগের ঘোষণা লন্ডনের বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ থেকে ঘোষিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে আরও কয়েকটি নিয়োগেরও ঘোষণা করা হয়। তাদের মধ্যে ছিল, উত্তরপ্রদেশের পরবর্তী রাজ্যপাল হচ্ছেন ডাঃ বি সি রায়।

ডাঃ রায়ের তখন চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসাবে জগৎ জোড়া খ্যাতি। এই ঘোষণার সময় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কয়েকদিন বাদে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। হয়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেই তিনি নতুন দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কলকাতায় ফিরেই পরের দিন নতুন দিল্লি। রাজধানী এক্সপ্রেস-এর আবির্ভাব অনেক যুগ পরে, প্লেন-এ যাতায়াতও তেমন চালু হয়নি। ভরসা কালকা মেল, হাওড়া থেকে সন্ধ্যায় ছাড়ে। হাওড়ায় উত্তরপ্রদেশের ভাবী রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ডাঃ রায়ের সঙ্গে এক কামরায় সহযাত্রী অমৃতবাজার পত্রিকার মালিক-সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ। সংবাদপত্রের মালিক-সম্পাদকরাও তখন সবে বিদেশ যেতে শুরু করেছেন। তুষারবাবু বেশ উৎসাহের সঙ্গে বিলেতের হোটেলে তাঁর জুতো পালিশ করতে এক সাহেবকে দেখে তার বিস্মিত বর্ণনা দিচ্ছিলেন। ডাঃ রায় একরাশ জল ঢেলে দিয়ে বললেন, তুষার, লন্ডনে আজকাল ওসব ব্যক্তিগত কাজের জন্য কেউ সাহেব নিয়োগ করে না, মেমসাহেব নিয়োগই রেওয়াজ। তুষারবাবু বোধহয় লজ্জা পেলেন।

সুযোগ পেয়ে ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কবে উত্তরপ্রদেশের গভর্নরের পদে যোগ দিচ্ছেন? বললেন, দিল্লি যাই, ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলি, তারপর ঠিক করব। তখন বুঝতে পারিনি কিন্তু ডাঃ রায়ের ওই মন্তব্যেই যথেষ্ট ইঙ্গিত ছিল রাজ্যপালের পদ গ্রহণ সম্বন্ধে তিনি মনস্থির করেননি। ডাঃ রায় দিল্লি থেকে কলকাতায় ফেরার আগেই সরকারিভাবে ঘোষিত হল, সরোজিনী নাইডু উত্তরপ্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁর বিখ্যাত সান্ধ্য মজলিশ এবার থেকে লখনৌ শহরে বসবে। আমরা জানলাম ডাঃ রায় গভর্নর হচ্ছেন না, কী হচ্ছেন তা জানার উপায় নেই। তবে ডাঃ রায়ের অন্য পরিচয়ের দরকার ছিল না, তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

গান্ধীজিও সম্ভবত একটু অবাক হয়েছিলেন বড় বড় পদের জন্য কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি দেখে। তিনি ডাঃ রায়কে এই সময় একদিন বলেছিলেন তাহলে তুমি শেষ পর্যন্ত 'হিজ এক্সেলেনসি' হতে রাজি হলে না! ডাঃ রায় হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, মহাত্মাজি, আপনি কি আমার পদাবনতি চান? গান্ধীজি অবাক। ডাঃ রায় বললেন তিনি 'রয়' বংশে জাত, তাই জন্মসূত্রে তিনি 'রয়াল'। উচ্চতায় তিনি ছয় ফুট চার ইঞ্চি। কাজেই তাঁর 'হাইনেস' সম্বন্ধেও কোনও সংশয় নেই। তিনি এতদিন 'রয়াল হাইনেস' ছিলেন, মহাত্মাজি কি চান যে গভর্নর হয়ে তিনি রয়াল হাইনেস থেকে কয়েক ধাপ নেমে 'হিজ এক্সেলেনসি' হয়ে যান? গান্ধীজি তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে হা হা করে হেসে উঠেছিলেন।

দিল্লিতে নেহরু ও মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে ডাঃ রায়ের আলোচনায় স্থির হয়েছিল যে ডাঃ রায় উত্তরপ্রদেশের গভর্নরের পদ নিচ্ছেন না। তাঁকে কী দায়িত্ব দেওয়া হবে তা কিন্তু স্থির হয়নি। আমরা ধরে নিয়েছিলাম তিনি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবেন। কিন্তু সে পদ অধিকার করে আছেন রাজকুমারী অমৃত কাউর। তিনি ছিলেন রোম্যান ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান, সংখ্যালঘু প্রতিনিধি। রোম্যান ক্যাথলিক হিসাবে তিনি কৃত্রিম উপায়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরোধী ছিলেন। তিনি যতদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন ততদিন জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোনও সরকারি সূচি ছিল না। এমন কী জন্ম নিয়ন্ত্রণ কথাটিও চালু হয়নি। তার জায়গায় পরিবার পরিকল্পনা, 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং' কথাটি উদ্ভাবিত হয় যা এখনও চলছে। ডাঃ রায় কলকাতায় ফিরে এলেন। তাঁর জায়গায় উত্তরপ্রদেশের গভর্নর হলেন সরোজিনী নাইডু। ডাঃ রায় বেকার।

বেশ কয়েক বছর পরে যখন ডাঃ রায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তিনি দিল্লি গেলেই ডাঃ জে পি গাঙ্গুলির বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করি, তিনি মুড-এ থাকলে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন, খোলাখুলি উত্তর দেন তখন একদিন সুযোগ পেয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দিল্লিতে কী হয়েছিল যাতে তিনি উত্তরপ্রদেশের গভর্নর হওয়া থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। ডাঃ রায় সেদিন গল্পো

করার মুড-এ ছিলেন। বললেন তিনি দিল্লি পৌঁছবার পরেই লেডি মাউন্টব্যাটেনের ফোন। বললেন ওই পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষের দেশে সুস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার জন্য বিরাট ব্যবস্থার যে প্রয়োজন সেখানে আপনার মতো একজন বিশ্বখ্যাত চিকিৎসক একটি প্রদেশের গভর্নর হয়ে রাজভবনে আটক থাকতে চান? ডাঃ রায় উত্তর দিলেন তিনি গভর্নর হতে চান না, কিন্তু নেহরু ও লর্ড মাউন্টব্যাটেন নাছোড়বান্দা। তাঁদের দু'জনকে বোঝানোর জন্যই তাঁর দেশে ফিরেই দিল্লি আসা। সেদিন রাতেই ওই দু'জনের সঙ্গে তাঁর কথা হবে। লেডি মাউন্টব্যাটেন ডাঃ রায়কে আবার জিজ্ঞাসা করলেন তিনি যে গভর্নর হতে চাননা তা তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত? ডাঃ রায় সম্মতি জানালে লেডি মাউন্টব্যাটেন বললেন, সেদিনের ডিনারে তাঁরও উপস্থিত থাকার কথা। কেবল তাঁরা চারজন। ডাঃ রায়কে কিছু করতে হবে না। যা করবার বা বলবার তা তিনিই বলবেন। ডিনারের পর আলোচনার জন্য যখন তাঁরা বসলেন তখন লেডি মাউন্টব্যাটেন শুরুতেই সরাসরি অভিযোগ করলেন, নেহরু ও মাউন্টব্যাটেনের কি মাথা খারাপ হয়েছে যে তাঁরা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মতো একজন বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসককে উত্তরপ্রদেশের গভর্নর পদে নিয়োগ করে ফিতে কাটার কাজে ব্যস্ত থাকতে বলছেন। এই সদ্য স্বাধীন দেশে পঁয়ত্রিশ কোটি অধিবাসীর চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য নিয়ে কত সমস্যা রয়েছে। ভোর কমিটির রিপোর্ট নিয়ে কত আলোচনা চলছে। এসব নিয়ে ভাববার কাজ করবার উপযুক্ততম ব্যক্তি হচ্ছেন ডাঃ রায়+তিনি নিজেও গভর্নর হতে চান না। অথচ তোমরা তাঁকে রাজভবনে বন্দি করে রাখতে বদ্ধপরিকর।

ডাঃ রায় বললেন, নেহরু ও মাউন্টব্যাটেন আমতা আমতা করে তাঁদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে কিছু বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু লেডি মাউন্টব্যাটেনের কথার তোড়ের সামনে তাঁরা দাঁড়াতেই পারলেন না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্থির হয়ে গেল ডাঃ রায় উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল হচ্ছেন না। কী হবেন তাও অবশ্য স্থির হল না।

ক্রমে কেন্দ্রে সব গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ হয়ে গেল। ডাঃ রায় বেকারই থাকলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় একজন মাড়োয়ারি মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সর্দার প্যাটেলের ইতিমধ্যে মতভেদ হয় এবং ডঃ ঘোষ পদত্যাগ করেন। ডঃ ঘোষ যখন মুখ্যমন্ত্রী, তখন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, একজনের বাড়ি ঢাকায়, অপরের ময়মনসিংহে। দু'জনেই পূর্ববঙ্গের, যা তখন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস রাজনীতিতে পূর্ববঙ্গের এই প্রাধান্য নিয়ে কথাবার্তা আরম্ভ হওয়ায়, এ রাজ্যের কংগ্রেস রাজনীতিতে নতুন গোষ্ঠী সমাবেশ হল—আরামবাগ গোষ্ঠীর নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও তমলুক গোষ্ঠীর নেতা অজয় মুখার্জি, নিকুঞ্জ মাইতিরা একত্র হলেন পূর্ববঙ্গের কংগ্রেসীদের আধিপত্যের অবসানের জন্য। ডাঃ রায় ছিলেন 'বর্ডারলাইন' কেস। তাঁর আদি বাড়ি খুলনা জেলায় যা 'র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে' পূর্ব পাকিস্তানে পড়লেও পূর্ববঙ্গের মূল অংশে নয়। তাছাড়া তাঁর লেখাপড়া বিহারের পাটনায় যেখানে তাঁর পিতামাতা

নেহরুর হাতে হাতে, পাশে ইন্দিরা

থাকতেন। বিহার তখন বঙ্গদেশের অন্তর্গত। কাজেই ডাঃ রায়কে পূর্ববঙ্গের মানুষ বলা যায় না। তবে ডাঃ রায়ের সঙ্গে কংগ্রেসের সর্বোচ্চস্তরের নেতাদের দহরম মহরম থাকলেও সাধারণ কংগ্রেসকর্মীরা তাঁকে বিশেষ পছন্দ করতেন না। কংগ্রেসের মধ্যে যোগ্য সহকর্মীর অভাব তিনি বোধ করেছিলেন তাই তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্বের পদ গ্রহণে অসম্মত হন। আবারও গান্ধীজিকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। তিনি পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে ডাঃ রায়কে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণে সম্মত হতে বলেন। ডাঃ রায় রাজি হয়েছিলেন কিন্তু তিনি একটি শর্ত করেছিলেন। কংগ্রেসের বাইরে থেকে তাঁর মন্ত্রিসভায় অন্তত তিনজন মন্ত্রী নেবেন—নলিনীরঞ্জন সরকার, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস। নলিনীবাবুর একটা বিশেষ ধরনের দুর্নাম ছিল। এবং নলিনীবাবুর শিল্পোদ্যোগী সহযোগী বলে সেই দুর্নাম কিছুটা ডাঃ রায়কেও স্পর্শ করেছিল। ডাঃ রায় ব্রাহ্ম

ছবি মোনা চৌধুরি

ছিলেন, ব্রাহ্ম মহিলাদের আধুনিকতা যার প্রতি শরৎচন্দ্রের কটাক্ষ হামেশাই পাওয়া যায়. সম্ভবত তাঁর এই কুখ্যাতির জন্য দায়ী ছিল। যাই হোক. সম্ভবত দা'ঠাকুরই নতুন করে ছড়া কাটলেন : বাংলার কুলবধূ হও সাবধান/মসনদে বসেছে নলিনী-বিধান।

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ছিলেন বিখ্যাত জমিদারবংশজাত। নিপাট ভাল মানুষ, ভদ্রলোক। তাঁর সম্বন্ধে আপত্তি বিশেষ ছিল না। তবে কংগ্রেসীরা প্রশ্ন তুললেন, জমিদারবাবুর এমন কী বিশেষ গুণ আছে যা কংগ্রেসীদের মধ্যে পাওয়া যাবে না এবং যার জন্য তাঁকে কংগ্রেসের বাইরে থেকে হয়ত ধরে ডাঃ রায়কে নিয়ে আসতে হবে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে চারুচন্দ্র বিশ্বাসের তখন বেজায় নামডাক। বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলায় ব্রিটিশ বিচারপতি ওস্টেলোর সঙ্গে সহমত হয়ে তিনি ভাওয়াল সন্ন্যাসীকে ভাওয়ালের মেজ রাজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ বলে ঘোষণা করায় তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সেসময় সরকারি কোনও কমিটি বা কমিশন বা তদন্ত হলে চারু বিশ্বাসের নাম উঠত সর্বাগ্রে। কিন্তু তাঁকে কংগ্রেসীদের অপছন্দ ছিল তিনি ঘোর সন্ত্রাসবাদী বিরোধী বলে। তাঁর বাবা আশু বিশ্বাস ছিলেন সরকারি উকিল, তাঁর পরিচালনায় অনেক মামলায় সন্ত্রাসবাদীদের শাস্তি হয়েছিল। তিনি আলিপুর আদালতের চত্বরেই সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে নিহত হন। চারু বিশ্বাস বাপের মতোই সন্ত্রাসের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং তাঁর রায়েও সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতা ফুটে উঠত। এককালের সন্ত্রাসবাদীরা পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই চারু বিশ্বাসের বিরোধী ছিলেন। ডাঃ রায় যখন তাঁকে মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান করেন তখনও তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। তিনি বিচারপতি পদে ইস্তফা দিয়ে মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। অনেক দর কষাকষির পর কংগ্রেস পরিষদীয় দল

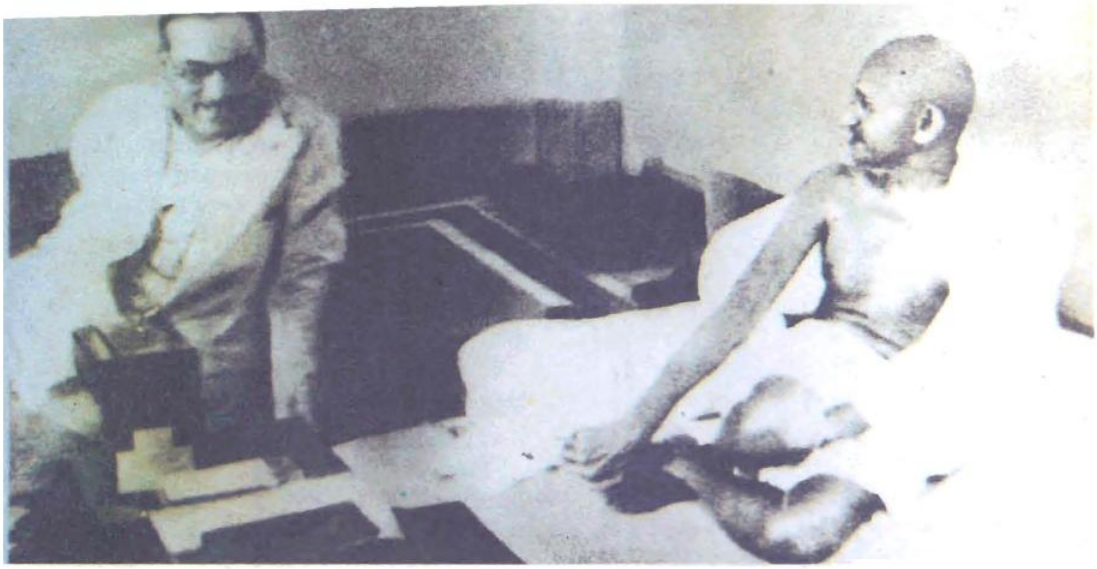

গান্ধীজির সঙ্গে

দু'জনকে নলিনী সরকার ও রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে মেনে নিতে সম্মত হল, কিন্তু চারু বিশ্বাসকে মন্ত্রী করায় তাঁদের আপত্তি থেকেই গেল। চারু বিশ্বাস তাঁর ইস্তফাপত্র ফেরত নিয়ে যে হাইকোর্ট তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা জানিয়েছিল সেই হাইকোর্টেই আবার ফিরে গেলেন। জওহরলাল নেহরু পরে চারু বিশ্বাসকে কেন্দ্রে আইনমন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন কিন্তু কংগ্রেসের সাংসদদের মনোভাব বদলায়নি। তখনকার রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ চারুবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। চারুবাবুকে রাজ্যপাল নিয়োগ করে রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর সুপারিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠিয়ে দেন। তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ। সেখানেই রাজেন্দ্রপ্রসাদের সুপারিশ চাপা পড়ে যায়। তাঁর সুপারিশের ভাগ্য রাজেন্দ্রপ্রসাদ জানতে পারেন যখন তিনি চারু বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করেন রাজ্যপাল হিসাবে তিনি কবে কার্যভার নিচ্ছেন?

এত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার অনেক আগে থেকেই তিনি একাধিক রাজ্যের শিল্পোদ্যমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। পশ্চিমবঙ্গ তখন শিল্পে দেশের এক নম্বর রাজ্য, তিনি পশ্চিমবঙ্গের সেই স্থান ধরে রাখলেন তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গে যেসব ভারি শিল্প ছিল না তারও গোড়াপত্তন করলেন। তিনি প্রথমেই চেষ্টা করলেন পশ্চিমবঙ্গে একটি ইস্পাত কারখানার জন্য। ইস্পাত কারখানা হবে সরকারি ক্ষেত্রে তাই তার জন্য কেন্দ্রের অনুমতি দরকার। তখন সবে ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়েছে, একমাত্র রাজ্য যেখানে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে সেটি ওড়িশা, সেরাজ্যে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে প্রাক্তন নৃপতি ও ভূস্বামীদের জোট। নেহরু বুঝতে পারলেন শিল্পে ওড়িশার পশ্চাৎপদটা কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণ তাই তিনি ঠিক করলেন ওড়িশাকে শিল্পে উন্নত করতে হবে। সেইভাবে কাগজপত্র তৈরি হয়ে গেল, ঘোষণা হল প্রথম ইস্পাত কারখানা হবে রৌরকেল্লায়, দুর্গাপুরে নয়। যে 'বিশেষজ্ঞ' এই রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন তিনি প্রোমোশন পেয়ে পুরস্কৃত হলেন কিন্তু রৌরকেল্লার ব্যয় অনেক বেড়ে গেল। ডাঃ রায় হাল ছাড়লেন না। দ্বিতীয় ইস্পাত কারখানা যাতে দুর্গাপুরে হয় তার জন্য ডাঃ রায় চেষ্টা করতে লাগলেন। এবার বাধা এল দক্ষিণ ভারত থেকে, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী টি টি কৃষ্ণমাচারির কাছ থেকে। তাঁর প্রস্তাব ছিল সালেমে কারখানাটি স্থাপিত হোক। অনেক টালবাহানার পর, হয়ত ব্রিটিশ সরকারেরও চাপ ছিল, স্থির হয় দ্বিতীয় ইস্পাত কারখানাটি ব্রিটিশ সহযোগিতায় দুর্গাপুরেই স্থাপিত হবে। নিকটবর্তী হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায় বিড়লাদের মোটরগাড়ি তৈরির কারখানাও এই সময় স্থাপিত হয়—হিন্দ মোটরস। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানাকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি বড় কারখানা গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ সহযোগিতায় মিশ্র ইস্পাতের কারখানা, যার জুড়ি তখন এদেশে ছিল না। সোভিয়েত সহযোগিতায় চশমার কাচ তৈরির কারখানা, মাইনস অ্যান্ড অ্যালায়েড মেশিনারি কারখানা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নেহরুর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সহযোগিতায় ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি নেওয়ার প্রস্তাব দেন। নেহরু স্লোগান তৈরি করেন, মেশিন টু বিল্ড মেশিনস। নেহরুর সমর্থন থাকলেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মহলানবিশের শত্রুও কম ছিলেন না। টি টি কৃষ্ণমাচারি মহলানবিশ নামটি বিকৃত করে তাঁকে বলতেন 'মহাবালুনি', সংখ্যাবিজ্ঞানকে তিনি উড়িয়ে দিতেন। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মনে করতেন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ভারতকে সোভিয়েত শিবিরে নিয়ে যাওয়ার একটি ফাঁদ। এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার সময়ই তিনি পদত্যাগ করেন।

ডাঃ রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বে এত দ্রুত শিল্পায়নে কোনও প্রতিবাদ না হওয়ার বড় কারণ তখন প্রধান বিরোধী পক্ষ ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্টরা তখন ছিলেন সোভিয়েত মুখাপেক্ষী, দ্রুত শিল্পায়নে বিশ্বাসী। কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয় ১৯৬৪ সালে, ডাঃ রায় মারা

যাওয়ার পরে। তাঁর সময়ে শিল্পায়নের বিরোধী বিশেষ কেউ ছিলেন না।

পশ্চিমবঙ্গ তখন যে শিল্পে দেশের এক নম্বর রাজ্য ছিল তা অনেকটাই কৃষির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে। ডাঃ রায়ের পরে মুখ্যমন্ত্রী হন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। তিনি নানারকমের বিধিনিষেধ আরোপ করে রাজ্যের অন্যত্র থেকে কলকাতায় কৃষিজাত পণ্য আমদানি বন্ধ করেন যাতে উচ্চ ক্রয় ক্ষমতার কলকাতায় জেলা থেকে কৃষিপণ্য না আসে। কলকাতার বাবুদের উপর তিনি ছিলেন বেজায় চটা, কলকাতার বাবুদের তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন ভাত না খেয়ে কাঁচকলা খেতে। কলকাতার বাবুরা সন্দেশ খাবেন আর গ্রামের শিশুরা দুধ খেতে পাবে না তা তিনি বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন কলকাতায় সন্দেশ তৈরি বন্ধ করে। কলকাতার বাবুরা প্রফুল্ল সেনের বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। প্রফুল্ল সেন পশ্চিমবঙ্গ যে শিল্পে দেশের এক নম্বর অধিকার করে রয়েছে তাতে গুরুত্ব দিলেন না। পশ্চিমবঙ্গে চালে ঘাটতি, ডালে ঘাটতি, তেলে ঘাটতি, সে কথা তাঁর প্রতি জনসভায় বলতেন এবং এই ঘাটতি দূর করার জন্য তিনি কী করছেন তার ফিরিস্তি দিতেন। শস্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য তিনি বড় বড় প্রকল্পের দিকে যেতেন না। কেননা সেসব সময় সাপেক্ষ, তিনি ছোট সেচ প্রকল্পের দিকে ঝুঁকতেন যাতে সহজে ফসল বাড়ে।

ডাঃ রায় কৃষিকে অবহেলা করেছিলেন বললে ভুল হবে। তাঁর সময়েই ময়ূরাক্ষী প্রকল্প (মোর প্রোজেক্ট) সম্পন্ন হয়। দামোদর ভ্যালি প্রোজেক্ট-এর গোড়াপত্তন তাঁর সময়ই হয়। এসবই ডাঃ রায়ের ভাবনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বিরাট বিরাট প্রকল্প। ডাঃ রায় আকারে যেমন মানুষটি বিরাট ছিলেন, ভাবনাতেও তাই। তিনি 'জাইগ্যান্টিজম'-এর ভক্ত ছিলেন, অনেকেই নেহরুর মতো। খাদ্য শস্যের ঘাটতির ও চালের দাম বাড়ার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে এরাজ্যে তখন কংগ্রেস বিরোধিতা দ্রুত বাড়ছে। এ রাজ্যের প্রথম কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তখন বিরোধীপক্ষে। তিনি বললেন, কংগ্রেস একটি গোটা জাতকে চোরাকারবারিতে পরিণত করেছে, বাঙালি হয়েছে 'আ রেস অব স্মাগলারস'। প্রফুল্ল সেন এরাজ্যে চালডালের ঘাটতি দূর করার জন্য বিকল্প শস্যের আমদানির চেষ্টা করেন। মহাকরণে কেরল থেকে আমদানি করা মাইলোর তৈরি খাদ্য প্রস্তুত করে খাওয়ানো হল। কাজের কাজ কিছু হল না। বাঙালি মাইলো খেল না। মুখে মুখে ব্যঙ্গ করে ছড়া তৈরি হয়ে গেল—মার মিলি খাইলো, আভাদির মাইলো। আভা মাইতি তখন অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী। 'পান'টি লক্ষণীয়। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার প্রতিটি চেষ্টাকে তখন বিরোধী দলগুলো ব্যঙ্গ করা শুরু করল। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের অবনতি ঘটল। শিল্পে শীর্ষস্থান তার হাতছাড়া হয়ে গেল, কিন্তু খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠল। কলকাতার বাবুরা আবার সন্দেশ খাওয়া শুরু করলেন, মাছের ঝোলে মাঝে মাঝে কাঁচকলা। চোরাকারবারির জাত চোরাকারবার ছেড়ে দিল, অবশ্য মুনাফাবাজি চালাল পুরোদমে।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ও কৃষির যেন চক্রবৎ পরিবর্তন হয়। মানুষের সুখদুঃখের মতো। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দ্রুত শিল্পায়নের উপর জোর দিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর তিনি আধুনিক বাংলার রূপকার—এই আখ্যা তাঁর কৃতজ্ঞ দেশবাসীর কাছ থেকে পেয়েছেন। তিনি কৃষিকে যথোচিত গুরুত্ব দেননি। কৃষিকে তিনি অবহেলা করেছিলেন, হয়তো তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বঙ্গদেশের বিভাগের পর অবিভক্ত বাংলার কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলো পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়ার পর একই সঙ্গে শিল্প ও কৃষির অগ্রগতি ও উন্নতি সম্ভব হবে না। তাঁকে দুটির একটিকে বেছে নিতে হবে। তিনি শিল্পকে বেছে নিয়েছিলেন, কৃষি পিছিয়ে পড়েছিল।

যতদিন ডাঃ রায় জীবিত ছিলেন, প্রফুল্ল সেন তাঁর মন্ত্রিসভায় বিশ্বস্ত অনুগামী হিসাবে খাদ্যমন্ত্রীর কাজ করে গেছেন। ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর প্রফুল্ল সেন হলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি তখন শিল্পের চেয়ে কৃষির উপর বেশি জোর দিলেন। পশ্চিমবঙ্গ তার সময় শিল্পে প্রথম স্থান তখন হারায় কিন্তু কৃষিতে উন্নতি করতে থাকে এবং কয়েক বছরের মধ্যে কৃষিজাত পণ্যে এরাজ্যে ঘাটতি দূর হয়ে স্বয়ম্ভরতার দিকে অগ্রসর হয়। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমলে তো শিল্প বা কৃষি কোনও দিকেই বিশেষ অগ্রগতি হল না। বামফ্রন্টের রাজত্ব তারও পরে। যে শিল্পায়নের বিজ্ঞপ্তি আজ বুদ্ধবাবুদের স্লোগান, তার আওয়াজ কিন্তু প্রথম তুলেছিলেন সেই 'রয়াল' ডাক্তারবাবুই। নাড়ি টিপে যিনি রোগ বলে দিতেন, এ রাজ্যের অসুখ সারাতে তাঁর দাওয়াই যে আজও অব্যর্থ, তাতে আর আশ্চর্য কী!

লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক

# আয় মন বেড়াতে যাবি

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

## পাঁচ

**অনেকে মজা করে হীরেন জ্যাঠামশাইকে এনশিয়েন্ট হিস্ট্রি বলে।** আর আমাদের হালিসহর হাইস্কুলের বাংলার মাস্টারমশাই তপনবাবু স্যারকে মডার্ন হিস্ট্রি বলে। দু'জনের মধ্যে বয়স আর কাজ কর্মে বিস্তর তফাৎ। দু'জনেই আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা করেন। টুকটাক প্রবন্ধটবন্ধ লেখেন এধার ওধার।

জ্যাঠামশাই সভাসমিতিতে বিশেষ নেই। আর তপনবাবু কলকাতা থেকে লেখক বা অন্যান্য গুণীজন পাকড়ে এনে প্রায়ই রামপ্রসাদের ভিটেয় সভা বসান। এ সব করতে করতেই কলকাতার এক বাংলা কাগজের স্থানীয় সংবাদদাতা। আর একই সঙ্গে সিদ্ধার্থ রায়ের পশ্চিমবঙ্গে দোর্দন্ড কংগ্রেসী নেতা। ধরে আন, পেড়ে ফেল্, পুঁতে ফেল্ বাহিনীর কর্তা।

জ্যাঠামশাই রিটায়ারমেন্টের পর ধুতি পাঞ্জাবি পরে মাথায় ছাতা আর এক হাতে চটের থলি বোঝাই খাতাপত্র নিয়ে পথে নামলেন। রোজ সকালবেলা তাঁর এই পরিব্রাজন আরম্ভ হত। থামতেন বেলা দুপুরে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে, পুরোটাই নিজের উদ্যোগে যোগাড় করতে লাগলেন হালিসহরের প্রতিটি বাড়ির পরিচয়। কোথা থেকে এলেন তাঁরা, ক-পুরুষ এখানে আছেন ইত্যাদি। দলিল-দস্তাবেজ বা পুরনো কাগজপত্র সব খুঁটে খুঁটে দেখতেন। সব খবর থলে বোঝাই খাতায় লিখে রাখতেন। সেই পরিশ্রমের ফল ফলল নিজের অর্থে অতি সযত্নে লোকাল প্রেসে ছাপা বই 'হালিসহরের মানুষ।'

একেবারে শুরুতেই জ্যাঠামশাই লিখছেন, 'দিল্লির আফগান সম্রাট 'শের শাহ' (১৪৭২-১৫৪৫), বাঙ্গালার শাসনকর্তা খিজির খানকে পরাস্ত করিবার পর, শাসন ব্যবস্থায় সুবিধার জন্য সমগ্র বঙ্গদেশকে সাতচল্লিশটি 'সরকারে' এবং প্রত্যেক সরকারকে কয়েকটি 'পরগণায়' বিভক্ত করেন। এইরূপ সাতগাঁ সরকারের অধীনে 'হাবেলীসহর' একটি পরগণা। হাবেলিসহর পরগণার অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রাম এই হালিসহর। হাবেলীসহর শব্দের অপভ্রংশ হালিসহর। হাবেলী অর্থে অট্টালিকা; পরগণার অন্তর্গত সকল গ্রামের মধ্যে কুমারহট্টই সর্বাপেক্ষা হাবেলীসমৃদ্ধ গ্রাম ছিল বলিয়া কুমারহট্টই এখন হালিসহর। হালিসহর কলিকাতা হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল উত্তর দিকে ভাগীরথী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। পৃথিবীর মানচিত্রে ইহার অবস্থান ২২°৫৬´ উত্তর/৮৮°২৯´ পূর্ব।'

হীরেন জ্যাঠামশাই তথ্য সংগ্রহে আমাদের বাড়ি এসে বেলা দুপুরে বার রোয়াক থেকে আমার ছোট ভাইয়ের নাম করে ডাকছেন, নিলয়, নিলয় আছ।

আমরা মা যুবতি বয়েস থেকেই বাড়িতে খড়ম পরত। আর পরতেন দাদু। ডাক শুনে মা খড়ম খটখটিয়ে এসে দোর খুলতে জ্যাঠামশাইয়ের নির্লিপ্ত মুখ, আমি এমন মিঠে করে ডাকছি—নিলয়, নিলয়, আর বউমা যদি খড়ম খটখটিয়ে এসে দোর খোলেন তাহলে কেমন লাগে বলুন দিকিনি।

সকাল বেলা সাইকেলে যাচ্ছি। জ্যাঠামশাই তিনতলা বাড়ির বার বারান্দায় বসে আছেন। আমি নেমে গিয়ে কথা বলি, কেমন আছেন জ্যাঠামশাই?

ম্লান হেসে কাসতে কাসতে জবাব দেন, আর বাবা, বার্ধক্যের বারাণসী। রাতে ভোর ঘুমোতে পারিনে।

মানেটা অনেক পরে ধরতে পেরেছি। বারাণসীর ডাক নাম তো কাশী। সেখান থেকে এসে মিলল কাসিতে।

আসলে আমাদের এই জ্যাঠামশাইয়ের দৌলতে হালিসহরের অনেক অতীত খবরপত্র পাওয়া যায়। একদিন বলে বসলেন, এককালে হালিসহর ছিল মদের ভাটিখানার জন্যে নামজাদা। প্রায় ঘরে ঘরে মাতাল। আমার ঠাকমা বলতেন সন্ধেবেলা মাঠ থেকে গরুগুলো পর্যন্ত টুলতে টুলতে বাড়ি আসত।

এবার আর এক মাতালে গপ্পো। কে জানে একে মিথ বলা যায় কি না। একবার আমাদের চৌধুরীপাড়ারই কালোয়াতি গায়ক যতীন মুখুজ্যে এক বন্ধু পুত্রের বিয়েতে নৌকো করে ওপার বাঁশবেড়িয়ায় বরযাত্র গেলেন। বিশাল দল। আর সবাই টলোমলো। সে যা হোক, পান ভোজন সেরে মাতালের দল তো প্রায় মাঝরাতে নৌকোয় এসে জমল। মাঝিরাও চুরচুর। দুগ্গা দুগ্গা বলে নৌকো তো ছাড়ল। যাত্রীরা হই হল্লা, খেউড় গান, টপ্পা—কেউ বা রামপেসাদী। বাঁশবেড়ে থেকে নৌকো চলে ঠিক উল্টো দিকের হালিসহর মুখো। একটু আড়াআড়ি। চলেছে তো চলেছে। ছপাত্ ছপ্ দাঁড় বাইছে মাঝি। একজনা তটস্থ হাল ধরে বসে আছে তো আছেই। গান হচ্ছে, গপ্পো হচ্ছে। সময় এগোচ্ছে। মাঝরাত টাল খাচ্ছে। কিন্তু ওপার যে আর আসে না। সবাই রাগে নিজেদেরই দুষতে লাগল। এত মদ মানুষে খায়! এই করতে করতে একসময় আকাশ পরিস্কার হই হই। তাতেও চেতন হয় না—আমরা তাহলে যাচ্ছি কোথা। ওই তো, ওপার হালিসহরের গ্যাসবাতিগুলো এখনও যে·

দেখা যাচ্ছে। বলি হলটা কী। কি হল মাঝি? মাঝি আর হালধারীও নিবু নিবু চোখে বলে—তাই তো। আরও জোরে জোরে দাঁড় বায়। অবশেষে প্রভাত থেকে পরিস্কার দিনমান হয়। স্পষ্ট রোদে জলস্থল জেগে ওঠে। আর তখনই সকলের চোখে পড়ে যেখানকার নৌকো সেখানেই আছে। খোঁটা থেকে কাছি দড়িটাই খোলা হয়নি।

১৯১০ সালের বেঙ্গল ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার—নদীয়াতে আইসিএস গ্যারেট সাহেব লিখছেন, 'As Guptapara is noted for its monkeys, Halisahar for its drankards... ।'

জ্যাঠামশাই আর পাঁচজনের মতন আমার দাদুকে মাস্টারমশাই বলেন। দাদুর কাছে আসেন, বসেন। নানান আলোচনা হয়। আমি পাশ থেকে শুনি হালিসহরের পুরাবৃত্ত। এখানকার টোল-চতুষ্পাঠির কথা। শাক্ত-বৈষ্ণবের এক ঠাঁইয়ে বসবাস কাহিনি। সেখান থেকে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ছটা। আমাদের হালিসহরের চৈতন্য ডোবার কাহিনি। সেখানে তাঁর গুরু ঈশ্বরপুরীর পাট। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের শ্রীচৈতন্য প্রয়াত গুরুর ভিটা দর্শনে এসেছিলেন সদলবলে। জ্যাঠামশাই তাঁর সুরেলা গলায় নিচু স্বরে আউড়ে যান, 'প্রভু বোলে কুমার হট্টেরে নমস্কার। শ্রীঈশ্বরপুরী যে গ্রামে অবতার।।'

কিন্তু এই সব ছাপিয়ে বারে বারেই উঠে এসেছে রামপ্রসাদী প্রসঙ্গ। সে সময়ের হালিসহর। অযোধ্যানাথ বা আজু গোস্বামীর ভগ্ন ভিটার হদিস তিনিই দেন। শিবের গলির এক তস্যগলির ভেতরে অযোধ্যানাথের পোড়ো ভিটে আর সেই বিলম্বী গাছ। টক টক স্বাদু ওই ফল ছেলেপুলেদের প্রিয়। সে সময়ে হালিসহর ম্যালেরিয়ার দাপটে অস্থির। হীরেন্দ্রনাথ আর বন্ধুরা বিলম্বী ফল পাড়তে গেলে ওই পোড়োর ভেতর থেকে 'গোঁসাই গিন্নী' নামে এক রাগী বুড়ি তাড়া দিতেন। ছেলেরা দৌড়ে আখড়াবাড়ির ঢিপি পার হয়ে পালাত।

লীলাকীর্তন ফুরলে মূল পূজা আরম্ভ। মন্দিরের ললাটে লেখা 'প্রসাদময়ী জগদীশ্বরী'। প্রসাদের আমলের বাইরে এই এখনটিতে আসামের এক ভক্ত স্বপ্ন পেয়ে ভিটায় পাথুরে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৫৭ সালের ২৬ শে জানুয়ারি। সেই থেকে কি বছর এখানে অন্নকূট উৎসব হয় ওইদিন। সে যাই হোক, বাইরে সুনসান এত মানুষ সত্ত্বেও। সবাই প্রায় চুপ করে। পঞ্চবটির দিকটা প্রদীপ নিবু নিবু নিঝুম। অদূরের বাড়ি বাড়ি দীপাবলীর মোমবাতি ও দীপমালা। কারও বাড়ি টুনি ল্যাম্প। দূরে কাছে, প্রচণ্ড শব্দে বাজী ফাটছে। আকাশে হাউই খেলছে। রাস্তায় পথিকের পেছনে ছুঁচোবাজী। রাস্তা দিয়ে প্যাঁকর প্যাঁক রিকশো যাচ্ছে। মাতালেরা মহা উল্লাসে হইরই করছে। হালিসহরের জনগণ সারারাত্রব্যাপী কালীপূজা দেখতে বেরিয়েছে মহাশ্মশান, রামপ্রসাদ ভিটা।

ওদিকে ভোগের ঘরে তুমুল ভোগ রন্ধন চলছে। বিপুল শব্দে সম্বার পড়ছে পূর্ণ ঠাকুরের হাতে। ওই সম্বারটাই নাকি খিচুড়ি রান্নার আসল তুক। সেটি যে পারে তার নাম পূর্ণ ঠাকুর। নরনারায়ণ ঘন ঘন পঞ্চবটির পেছনে যাচ্ছেন ও ফিরে আসছেন। উনুনের গণগনে আগুনে তাঁর তামাটে মুখমণ্ডল লালচে আকার ধারণ

তহবিলদার খাতা নিয়ে মিত্তির মশাইকে দেখিয়ে বললে, একটা পাগল-মাতালকে খাতা সারতে দিয়ে কি সর্বনাশ করেছেন

করছে। উনুনে থেকে থেকে বিকট শব্দে কাঠের গাঁট ফাটছে। বাবা কারণ আনন্দে বলে উঠছে, এবার কালী তোমায় খাবো।

পূর্ণ ঠাকুরের মতন যারা কার্য আর কারণ জানে তারা কিছু না বলে মিচ্‌কি হাসছে। অজানাগণ অবাক হয়ে দেখছে। তারা ঠিক ধরতে পারছে না এই ঘন ঘন পুলকের কারণ কি।

ভোগ নামে ভোরবেলা। বাবার দায়িত্ব এখনকার মতন শেষ। তাই সিধে বাড়ি। মা উঠে দোর খুলে দেয়। চা করে দেয় বড় এক কাচের গ্লাস। মশারি খাটানোই ছিল। বাবা বাঁ নাকে দীর্ঘ নস্যি নিয়ে পাশবালিস সাপটে শুয়ে পড়েন। একটু পরেই তাঁর নাক ডাক ছাড়ে।

সকালবেলা বাবা মন্দিরে যাবার আগে মা কেবল বলেছিল, দুটো মায়ের ভোগ পাঠিয়ে দিও না।

বাবার গম্ভীর জবাব, সম্ভব নয়।

—কেন! পয়সা দিয়ে নেবো। ভোগের টিকিট কাটলে তো যে কেউ পায়।

—এটা তো যে কেউর বাড়ি নয়। প্রেসিডেন্টের বাড়ি। লোকে বলবে ওনার বাড়ি ফ্রিতে ভোগ যাচ্ছে।

—কেন টিকিট কাটবো তো।

—টিকিট কাটলেও। পাঁচজনে জানবে কি করে।

—ভেবেছিলাম আজ একটু ভোগ খাবো।

—এককাজ করো। বাড়িতে গোবিন্দভোগ চালের খিচুড়ি রেঁধে তাতে দুটো তুলসী পাতা ফেলে দাও। বাস্—ভোগ হয়ে যাবে।

বড়মা ঘরের কানাচ থেকে বলেন, ওরে পাষণ্ড কালীপুজোয় তুলসী নয়। বিল্বপত্তর বল্।

নিধিরাম সেন সেনজ রামপ্রসাদের বৈমাত্রেয় অগ্রজ হলেও সম্পর্কটি রক্তের বাইরে বাইরে নয়। প্রসাদ অগ্রজকে মান্য করেন। অগ্রজও যথার্থ স্নেহ বশত ভাইয়ের খবর করেন প্রায়ই।

নিধিরাম উঠানে নেমে দাঁড়িয়েছেন—প্রসাদের সুমুখে। ভজহরি হাতে ধরা হেঁড়ো আলোখানি একপাশে নামিয়ে রেখে নিধিরামকে একটি পেন্নাম ঠুকে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।

রামপ্রসাদ হেঁট হয়ে দাদার পায়ে হাত ছোঁয়ান। নিধিরাম তাঁর মাথায় হাত রাখেন। প্রসাদ সেই অবসরে শত-সহস্রবার মনে করা উপমাটি মনে মনে ঝালিয়ে নেন। না নিয়ে পারা যায় না। নিধিরাম সেন ভিষক-বৈদ্য, বাবা রামরাম সেনের বৃত্তিধারী। আর তাঁর চেহারাটিও পিতৃদেব ছেনে বসানো। যেন মৃত পিতা এসে দাঁড়িয়েছেন প্রসাদের সঙ্গে কথা কইবেন বলে। এখানে—এই কবিরাজ বংশে রামপ্রসাদই একমাত্র বৃত্তিছাড়া মহাপাষণ্ড।

রামপ্রসাদ বলেন, কখন আসা হল দাদা? সব কুশল তো?

নিধিরাম অস্পষ্ট হাসেন, সব কুশল কি করে বলি প্রসাদ।

—কেন দাদা! একথা কেন!

একটুক্ষণ বিরাম। এক ফোঁটা দীর্ঘশ্বাস। তারপর নিধিরাম কথা বলেন, সব কুশল তো তোকে বাদ দিয়ে নয় প্রসাদ।

রামপ্রসাদের সিন্দুর আঁকা কপাল মধ্যে কুঞ্চন। হেঁড়ো প্রদীপটির এলে পড়া আলোয় সেখানে বিজাতীয় রক্ত আখর। পান রসাক্ত দু-চোখে ছলছল উৎকণ্ঠা।

—কি হল দাদা! এমন করে কথা কইছ কেন!

নিধিরাম ম্লান হেসেও হাসেন না। সে কথা কি তোকে সমঝাতে হবে! এত লেখা পড়া—আরবি, ফার্সী, সংস্কৃত শিক্ষা করার ফল এই!

—কি ফল দাদা?

—তাছাড়া কলকাতার নবরঙ্গকুলাধিপতি দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাছারিতে অমন মুহুরির কাজটা ছেড়ে চলে এলি। সেও তো আজকের কথা নয়।

—হ্যাঁ দাদা, তখন সবে বাবা গত হয়েছেন। সংসারে অভাব। জোতজমাও এমন কিছু নেই যে তাই দিয়ে সংসার নির্বাহ হয়।

—কিন্তু বাবা চেয়েছিলেন তুই পূর্বপুরুষের বংশবিদ্যে কবিরাজী নিয়ে থাকিস।

—কবিরাজ না হোক্ কবি তো হয়েছি দাদা। পাঁচজনে তো সে কথা বলে।

—মিত্তির মশাই তো মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন।

—হ্যাঁ দাদা, হিসাবের খাতায় গণেশের বদলে শ্রী শ্রী দুর্গানাম লিখেছিলাম। আর একদিন দেহে কিরকম উন্মাদনা হল। আমি তো জানি না দাদা কেন হল, কেমন করে হল। তবে ওই জমাবন্দী খাতায় একখানি গীত লেখা হয়ে গেল।

—জানি প্রসাদ। সেই তোর প্রথম গান রচনা। আমায় দেও মা তবিলদারী। আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী।। পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি। ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।।

রামপ্রসাদ কতক আত্মগত স্বরে বলেন, হ্যাঁ দাদা, গীতখানির শেষে ছিল, প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লোয়ে আমি মরি। ও পদের মত, পদ পাই তো, সে পদ্ লোয়ে বিপদ সারি।। কিন্তু দাদা, তহবিলদার খাতা নিয়ে মিত্তির মশাইকে দেখিয়ে বললে, একটা পাগল-মাতালকে খাতা সারতে দিয়ে কি সর্বনাশ করেছেন। এমন সুন্দর পাকা খাতাখানা একেবারে নষ্ট করে সেরেছে।

—হ্যাঁ প্রসাদ, আর মিত্তিরমশাই সে খাতা দেখে কেঁদে আকুল। তিনি বললেন, এ বেক্তি তো পাকা খাতায় পাকা কর্মই করেছে। তারপর মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি ধার্য করে তোকে কর্ম থেকে খালাস দিলেন।

—হ্যাঁ দাদা, আমি প্রতিদিন সেই অন্নদাতা মানুষটির কথা স্মরণ করি। আমি তো নিমকহারাম নই দাদা।

—তাছাড়া রাজা কেষ্টচন্দরও তো কিছু ভূমিদান করেছেন।

—হ্যাঁ। মহারাজ আমায় তাঁর সভাসদ করতে

বর্ষাফুর্তি
সম্ভার
"আগামীকাল বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।"
শ্রীলেদার্স আছে তো!
60404
Rs. 124/-
শ্রীলেদার্স নিয়ে এলো বর্ষার দারুণ কালেকশন "বর্ষাফূর্তি সম্ভার"।
ফাটাফাটি কালার রেঞ্জ। দাম একদম নাগালের মধ্যেই।
Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।
Genesis 2333

কথা চলতে চলতে দুই ভাই ঘরের দাওয়ায় উঠে পড়েন। আর অমনি ছোটখাটো কচি শোর পড়ে যায়। ছেলেমেয়ে পরমেশ্বরী আর রামদুলাল দুদ্দাড় ঘর হতে বেরিয়ে আসে। দুটি ভাইবোন পিতৃসঙ্গ থেকে প্রায়ই বঞ্চিত, ফলে কাছে পেলে তারা উত্তাপ চায়। যেহেতু ছেলে রামদুলার কন্যার চেয়ে কিছু বড় তাই তার উল্লাস প্রকাশ খানিক সাব্যস্ত। সে এসে শুধু বাবার বাম হাতের উপর দিকটি ধরে দাঁড়ায়। আর মেয়ে লাফ দিয়ে দিয়ে বাবার গলা জাপটে ধরতে চায়। প্রসাদ হাসতে হাসতে বলেন, রোসো মা, রোসো মা। অমন করে আমি পড়ে যাব যে।

হেঁশেল থেকে ঘোমটাবতী সর্বানী এসে হাত মুখ ধোয়ার গাড়ু আর গামছা রেখে যায়। যাওয়ার সময় সে পরমেশ্বরীর হাতে ধরে টান দিলে প্রসাদ বাধা দিয়ে বলেন, থাক্ না, থাক্ না। মায়ে-পোয়ে বলে কতক্ষণ পর সাক্ষেৎ হল।

মা সিদ্ধেশ্বরী প্রসাদের মতন গৌর অঙ্গ না হয়ে বুঝি তাঁর নিজের পিতৃ-মাতৃধারায় চাপা রঙা। মাথার চুলে কোঁচকানো ধাত রইলেও কোথাও একটু সারল্য। আর বেশিরভাগই দুধ ঢালা। প্রায় নিদন্ত মুখ জোড়া হাসি।

—কি ভাগ্যি আমার। জোড়া ছেলেকে এক ঠাঁয়ে বলে কদিন পরে পেলুম। বলি অ বৌমা, আমার পুত্তুরদের কি সেবা করাবি আজ?

তারপর সিদ্ধেশ্বরী গলা নিচু করেন, বলে তো দিলুম। ভাঁড়ার তো সব সময়েই বাড়ন্ত।

এই কথাটুকু দু-ভাইয়েরই কানে যায়। প্রসাদ কতক দণ্ড পাওয়া আসামীর ধারায় পরমেশ্বরীকে কোলে তুলে নিয়ে তার মুখে চুমো দেন। চুমো দেন আর বলে চলেন, মা মা, মাগো।

পাশ থেকে নিধিরাম বলে ওঠেন, আজ বরং মাড় ভাত হোক্ না। তুমি তো জানো মা, আমি ওটি কত ভালবাসি। সঙ্গে একটু আলু-বেগুন ভাতে। তোমার উঠোনে দিব্যি বেগুন হয়েছে মা। মুক্তকেশী বেগুন।

রামপ্রসাদ মেয়ের কানের কাছে গুন গুন করে ওঠেন, মুক্ত কর মা মুক্ত কেশী, ভবে যন্ত্রণা যাই দিবানিশি—

পুত্র হাসে, বেগুন থেকে গান বল্লে বাবা।

প্রসাদ গান থামিয়ে বলেন, গান তো পথে ঘাটে, ভূমণ্ডলে ছড়ানো আছে বাবা।

ছবি শান্তনু দে

(চলবে)

# পথের পাঁচালি

ডানদিকে চাইলে সপ্তঋষি, সপ্তর্ষিমণ্ডল। বাঁদিকে চাইলে কালপুরুষ, ঝকঝকে লুব্ধক, উজ্জ্বল। পিছনে তাকালে উজ্জ্বলতর শৈশব। ওপরে চাইলে আকাশ, মস্ত বড় আকাশ...যে আকাশে আমার মুক্তি...
জয়া মিত্র

**দিদু যে সারাজন্ম রইল কাশীতে কিন্তু দুটো জিনিস আয়ত্ত হল না—হিন্দি বলা আর গঙ্গায় স্নান করা।** বাসন ধুতে আসত যে বেসর, যে কিনা অনেক আগে একবার নিজেদের খোড়ো ঘরের আড়া থেকে সাপ ঝুলতে দেখে নিজের শাড়ির আঁচলে বরকে পুরো ঢাকা দিয়ে বসে তারপর চেঁচিয়ে লোক জড় করেছিল, সেই বেসরের মোছা ঘরের কোনায় বা মাজা বাসনে ময়লা আছে বলে দিদু নিজের হিন্দিতে বেশ খানিক বকে-টকে অন্য ঘরে চলে গেলে বেসর পিসিকে জিজ্ঞেস করত 'মাইজি কা বোললিন?' সন্ধ্যের পর নিচের দরজার সামনে থেকে যেই গোয়ালার হাঁক আসত 'মাইজি, দুধ' দিদুর বারোমাসের সাড়া ছিল, 'র'রে, আতা হ্যায়' ছোটকাকা হাজার খেপালেও দিদু অটল।

আর গঙ্গার ঘাট। সকাল সকাল কোনওদিন পিসিকে, তাদের দুইবোনকে নিয়ে মা গঙ্গায় স্নান করতে গেলে এক একদিন দিদুও সঙ্গে যেতেন। কিন্তু ঘাটের শেষ সিঁড়িতে জলের কিনারা পর্যন্ত। হাতে করে একটুখানি গঙ্গাজল তুলে নিজের মাথার দেওয়ার সময়ে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কী সব বলা! মাখনের মতো গায়ের রঙে অসম্ভব গোলাপী ছিল ঠোঁট। সেই ঠোঁট দুটি বহুসময়েই নিঃশব্দে বিড়বিড় করে নড়ত। গঙ্গার ঘাটে বসে ছোট গোল কাঁসার ঘটিখানা যাকে তারা বলত, লট্‌কী, তাই দিয়ে গঙ্গাজল তুলে তুলে মাথায় ঢালার সময়, ঘাটের অনেক সিঁড়ি ভেঙে উঠে কালিতলায় ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে কিংবা বাড়ির তিনতলার ঠাকুরঘরে ঠাকুরদের সামনে রাখা বাতাসাটা তামার রেকাবির গোড়ায় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে। ওরকম নিচু জায়গায় সেই ঠোঁট দেখতে পাওয়ার কারণ ছিল দিদুর দু'পাশে তাদের দু'বোনেরও অমনই মাথা ঠেকিয়ে বিড়বিড় করা আর মাঝেমাঝে আড় চোখে দেখতে থাকা যে দিদু উঠল কি না। উঠে সামনে প্রথম যাদের দেখতে পাবে তাদের ভাগে পেঁড়া বা বাতাসা আস্ত। বাকিদের ভাঙা ভাঙা। দিদু যে ঠাকুরকে কী বলত সে কথা কে জানে, তাকে কিন্তু একটা মন্ত্র বোন শিখিয়ে দিয়েছিল, তারা দু'জনে এক মনে ভগবানকে সেটাই বলে যেত—টিক্কি ধরে মারব টান
চলে যাবি বর্ধমান

এইভাবে বোন তাকে এবং সে বোনকে অনেক কিছু শেখাত। যেমন কাকা-পিসির ভূগোল বইয়ে পাশাপাশি দুটো পৃথিবীর ছবি দেখে সে বোনকে বুঝিয়েছিল এর একটা বাস্তব পৃথিবী, একটা কল্পনার পৃথিবী। বড়োরা সবাই যে তাকে সবসময়ে বলত, এবার একটু কল্পনার পৃথিবী ছেড়ে বাস্তব পৃথিবীতে নামো।' অনেক পরেই না সে জানতে পারল যে ওই ছবিগুলোকে বলে পূর্ব গোলার্ধ আর পশ্চিম গোলার্ধ। ছাদের কোণগুলো ছিল তাদের নিরিবিলি, খেলবার জায়গা। সেখানে বসে তিনটে গামছা দিয়ে বেণী বেঁধে বোন বলত 'আমি বেশ একটা রাজকন্যা...আমার বেশ নাক, কান নেই।' মুখের ওপর এইসব এবড়োখেবড়ো বস্তুগুলোকে আপদবিশেষ ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি হয়তো! খেলার অন্য সাথীও ছিল।

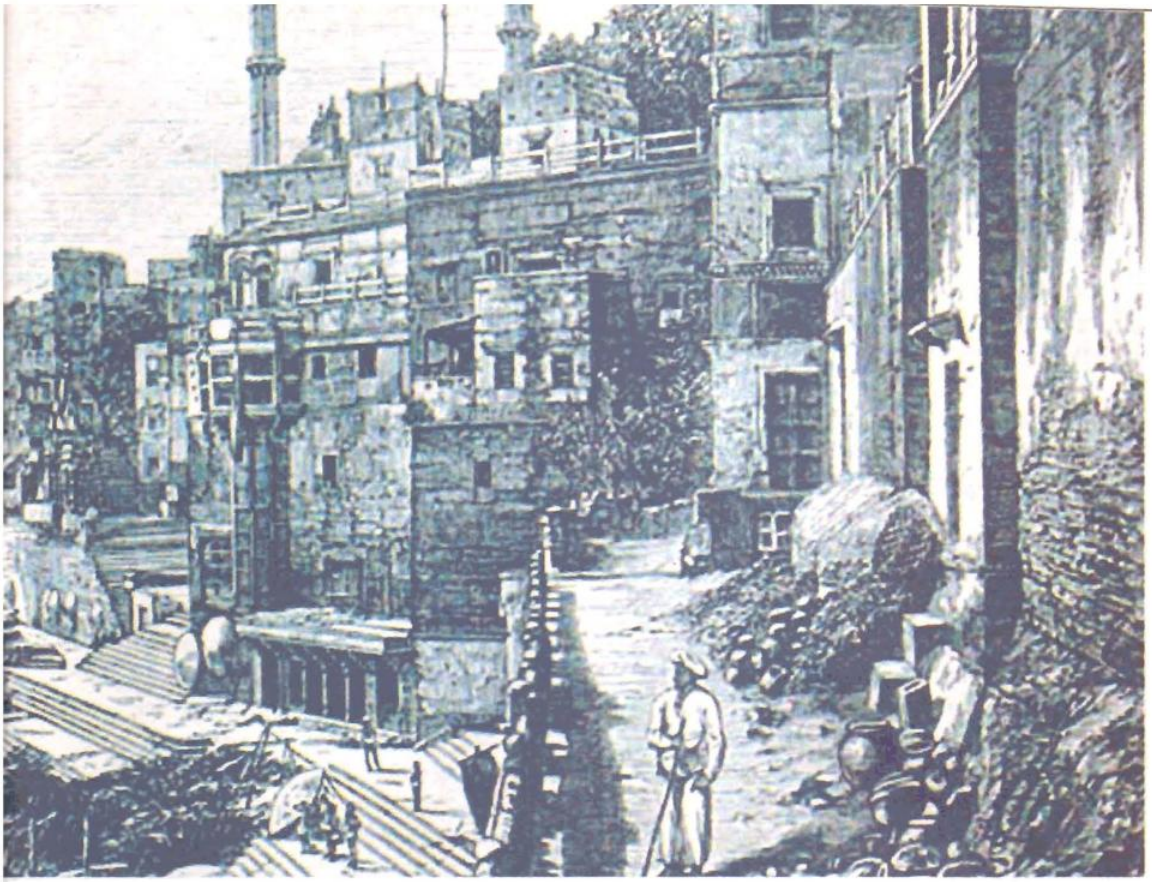

পাশের একটা বাড়ির ঘুলঘুলিতে দুটো চড়ুই পাখি থাকত। তাদের নাম দেওয়া গিয়েছিল চড়ুয়া-বড়ুয়া। নানারকম এ্যাডভেঞ্চারের গল্প হত তাদের নিয়ে। দু'জনেরই জানা যে ওরকমটা ঘটেনি কিন্তু তাতে অসুবিধে কিছু নেই।

ছাদে খেলার প্রকারভেদও ছিল। তার শেষটা যে সর্বদাই খুব সুখদায়ক হত এমনও নয়। গ্রীষ্মের বিকেলের শুকনো ঝড়ের মধ্যে মায়ের ছাদে মেলা একটা শাড়ি তুলে এনে ছোটকাকা যখন বোঝাতে চায় যে খুব ঝড়ে নৌকোর পাল কীরকম ফুলে ওঠে, তার হাতে ধরিয়ে দেয় শাড়ির দুটো খুঁট, বাকি দুটো নিজে ধরে শাড়িটা টান করে মেলে ধরে। ঝড়ের একটা জোর ঝাপটা আসে আর স্পষ্ট শেখা যায় যে প্রবল ঝড়ে পালের নৌকো কেমন বানচাল হয়। সেই শাড়িরূপী পাল তো তাদের হাত থেকে ছিটকে পাক খেয়ে উড়ে চলে গেছে—। ঝড়ে দু-একদিন চুপিচুপি ডেকচির ঢাকনাও উড়িয়েছিল তারা। শেষ পর্যন্ত তার ফলাফল খুব ভাল হয়নি হয়ত, কিন্তু তাতে আর কী! নিতান্ত সাধারণ একটা এ্যালুমিনিয়ামের ডেকচির ঢাকনা—ঝড়ের বাতাস লাগলেই সে যে হাতের মধ্যে কীরকম জীয়ন্ত প্রাণীর মতো থরথর করে কেঁপে ওঠে! তখন তাকে ছেড়ে না দিয়ে পারা যায় নাকি! সত্যিকারের জীয়ন্ত জিনিসে কিন্তু তার সাংঘাতিক ভয়। সেখানে ছোটকাকার সঙ্গে বোনের ভাব বেশি। শীতের দিকে মাঝেমাঝেই স্কুল থেকে ফেরা বা অন্য কোনও ফাঁকে রাস্তা থেকে ছোট কুকুরছানা ধরে আনত কাকা। একদম চুপিচুপি সেটাকে নিয়ে যেত ছাদে। বহুকষ্টে খুঁজে পেতে আনা একটা কাগজের বাক্স কিংবা ঝুড়িটুড়ি কিছুর মধ্যে দু-একটা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো পেতে তাদের রাখবার চেষ্টা করত। সাধারণত এই জিনিসপত্রগুলো একতলা কিংবা তিনতলা থেকে বড়দের না বলেই চেয়ে আনতে হত। অত সামান্য জিনিসও যে দিতে চাইত না বড়রা। কুকুরছানার নাম শুনলে প্রথমেই হাঁ-হাঁ করে উঠবে। তো এই পুরো জোগাড়যন্ত্রের ব্যাপারটায় সে ওদের সঙ্গে থাকবে কিন্তু সত্যিকারের কুকুরছানাটাকে নিয়ে আসবার পরই হবে মুস্কিল—সেটাকে যে কেন তার এত ভয় করবে, তার একেবারে কোনও যুক্তি নেই। কিন্তু ক'টা জিনিসেরই বা যুক্তি থাকে!

গঙ্গায় সাঁতার কাটতে কার না ইচ্ছে যায়, কিন্তু জলে নামতেও যে বড্ড ভয় করে, তার কী করা! কতখানি চওড়া নদী, ওপারে অনেকদূরে রামনগরের চড়ায় রোদ্দুরে বালি ঝকমক করে, হলদেটে মাটি রঙের জল ছোট ছোট ঢেউ তুলে বয়ে যাচ্ছে—কী অদ্ভুত সুন্দর, কী ভয় ভয়, মনে হয় দেখতেই থাকি। দেখতেই থাকি। হঠাৎ কখনও সবাই 'ওই-ওই' বলে চেঁচিয়ে ওঠে, দেখা যায় জলের মধ্যে কী যেন একটা কালো ফুটবলের মতো ডুবে গেল। মা বলত শুশুক। সেই প্রাণীকে তো কোনওদিন দেখা গেল না, কে জানে শুশুক মানে কুমির কি না? নদীতে নামলে কামড়াবে কি না! মা সাঁতার দিয়ে কতদূর চলে যায়, আরও কত লোক চান করে, তবু জলের নিচে কী যেন কীরকম। ঘাটের সিঁড়িতে সুন্দর

গঙ্গার মতো গঙ্গামাটিও খুব সুন্দর। ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে যখন রাস্তাঘাটে লোকজন কিছু নেই সে সময়ে খুব বড় খাঁচি নিয়ে রাস্তায় ডাক দেয় 'পোতানি মাটি লেবু-উ-উ।' মায়েরা কেনে। নরম মাটি বরফি কেটে খাঁচি ভরে সাজানো। কেমন নরম রং। এত বড় শহরে উনুন লেপার মাটি কোথায় আর ওই গঙ্গামাটি ছাড়া। তা থেকে তিনটে চারটে মা যদি কোনওদিন খেলতে দেয়, সে যে কী আনন্দ

ছোট ছোট ছলাৎ শব্দ। দুটো ধাপ নেমে হাঁটুসমান জলে একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকেই উঠে পড়ে সে।

কোনও কোনও দিন চৌষট্টিঘাট থেকে, ওই ঘাটেই বেশিরভাগ দিন যায় তো তারা, উঠে তার আর বোনের হাত ধরে দিদু রাস্তা পার হয়ে কালিতলার মন্দিরে একটু প্রণাম করে কাছেই মস্ত বটগাছের নিচে একটা দোকানে যেত। সেটাকে বলে চিন্তামণির দোকান। সেখানে ধুতি পরা খালি গায়ে চিন্তামণির পেছনে তাকের ওপর কালো কালো বেঁটে বেঁটে সব কৌটো সারি দিয়ে বসে থাকে। তাদের গায়ে সাদা রঙে বচ, পিপুল, রিঠা—এইসব লেখা। ঠিক যেন ভূতেদের মুখে সাদা-সাদা দাঁত।

গঙ্গার মতো গঙ্গামাটিও খুব সুন্দর। ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে যখন রাস্তাঘাটে লোকজন কিছু নেই সে সময়ে খুব বড় খাঁচি নিয়ে রাস্তায় ডাক দেয় 'পোতানি মাটি লেবু-উ-উ।' মায়েরা কেনে। নরম মাটি বরফি কেটে খাঁচি ভরে সাজানো। কেমন নরম রং। এত বড় শহরে উনুন লেপার মাটি কোথায় আর ওই গঙ্গামাটি ছাড়া। তা থেকে তিনটে চারটে মা যদি কোনওদিন খেলতে দেয়, সে যে কী আনন্দ! দু-বোনে ছাদের সিঁড়িতে বসে বানায় পুতুল। পাখি। তার খুব ভাল লাগে নৌকো বানাতে। নৌকোর পাটাতনও বানাতে পারে, কিন্তু মাঝি বানাতে পারে না। মাঝি বানানো খুব শক্ত। একটা নৌকা মায়ের ঘরের তাকে রাখা রইল কিছুদিন। মায়ের এই দোতলার ঘরের জানলাগুলো মেঝে থেকে শুরু। দরজার সমানই লম্বা। ঠিক সামনেই একটা গোয়ালে থাকে ভোলাকাকা আর তার ছেলে হীরুয়া। আর গরুরা। ভোলাকাকা কাকাদেরও ভোলাকাকা আবার তাদেরও। তার ছোট শান্ত ভাইটা নিজের দু'বছরের পা জানলার শিকের ফাঁকে গলিয়ে দিয়ে ভ্যাঁ করে কাঁদছিল, ভোলাকাকা গোয়ালে দাঁড়িয়ে বলছিল, কানছ কেন খোঁখাবাবা, টিয়াপাখি লিবে?' শুনে ভাই চুপ করে গেল। সেও করত। কাঁদলে তো তাকেও টিয়াপাখির আশ্বাস দিত ভোলাকাকা।

গোয়াল আর তাদের বাড়ির মাঝখানের সরু গলিটাকে দোতলা থেকে দেখা যায় না। ইঁট বাঁধানো গলিটা দিয়ে বেরলে গোয়াল পার হয়েই সীতাবুয়াদের বাড়ি। তার দোতলায় সাবিত্রীদিদিরা থাকে। মায়েদের সীতা বুয়া। মায়েরই সাবিত্রীদিদি। সাবিত্রীদিদিদের বাড়িতে একবার অনেকদিন ধরে সন্ধ্যে থেকে রাত অবধি ঢোলক পিটিয়ে গান হত। কাদের একটা বিয়ে ছিল। গলির শেষ মাথায় মহারাজের দোকান। সেখানে সবকিছু পাওয়া যেত—চিনি তেল আরও কত কী কে জানে! দিদু কাকাদের বলতেন এটা নিয়ে আয় মহারাজের দোকান থেকে। ওই মোড় থেকে ডান দিকে ফিরলে কয়েকটা বাড়ির মধ্যে একটা ছিল জয়রামদের বাড়ি। সে ওই বাড়ির একজনকে তারা যেতে আসতে দেখতে পেত। জানলা দিয়ে মোটেই নয়, রাস্তায় দাঁড়িয়ে পা উঁচু করলে ওদের ঘরের জল বেরবার যে নালি সেটার ফুটো দিয়ে দেখা যেত। সেই লোকটি ধুতি পরা আর কাঁধে একটা গামছা, ঘরের এক কোণে আসনে বসে দু'হাতে মন্দিরা বাজিয়ে বলে যেত, জয়রাম সিরিরাম জয়রাম সিরিরাম—সারাদিন রাত সারারাত কি না সে জানে না, কিন্তু তারা যতবার ওখান দিয়ে পার হয়েছি, কখনও বন্ধ দেখেনি।

গোয়ালের পেছনে একটা ভাঙা পাঁচিল ঘেরা বনজঙ্গল জায়গা। সেটাকে বলত বাগান। কেন বলত, কার বাগান—সে সব কোনওদিন জানা হয়নি। সেই বাগানের জঙ্গলে একদিকে একটা মস্ত বড় কাঞ্চনফুলের গাছ। হালকা, বেগুনি কাঞ্চনফুল যেন ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতির মত। তাই হাতেখড়ির পর হাতের লেখা ভাল করবার জন্য সুন্দরকাকা যখন তাকে শ্লেটে প্রতিদিন 'ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল' কবিতার একটা করে লাইন লিখে দেয় তখন সে 'বিকশিত'র মানে না জেনেও কবিতাটা বুঝতে পারে। দূরে কোন শয্যায় একা কোনও ছেলে, বংশীর ধ্বনি শুনে ভাবে চোখ মেলে, যেন কোনও যাত্রী সে রাত্রি অগাধ, জ্যোৎস্না সমুদ্রের তরী যেন চাঁদ' লিখতে লিখতে সে স্পষ্ট বুঝতে পারে যে তারই কথা লেখা আছে এখানে। তার যখন গরমের দিনে ছাদে ঘুমোয়, অনেকরাত্রে এক একদিন ঘুম ভেঙে আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত যখন সে আকাশ মেঘ আর সরে সরে যাওয়া চাঁদের

ওই আকাশে যে কত কী! শীতের রোদে ছাদে দিদু সতরঞ্চি পেতে পা মেলে বসে মটরশুঁটি ছাড়াচ্ছে। পিঠের নিচদিকে দিদুর চুলের কেঁকড়ানো ডগা, কোলের ওপর মটরশাকের হালকা কৌকড়ানো আকর্ষগুলো, হালকা নীল গোলাপি ফুল

আবার কোনও কোনও দিন সন্ধের পর সব কাজকর্ম শেষ করে মা এক গামলা কাচা কাপড় নিয়ে ছাদে এসে উঠত। ছাদের মাঝখানে একটা লম্বা উঁচু সিমেন্টের বেদী মতো ছিল। মায়ের হয়তো খুব পিঠে ব্যথা করত তখন, কাপড় মেলবার আগে না সেই বেদীটার ওপর একটুক্ষণ চিৎ হয়ে শুতো। মায়ের সেই হালকা ভেজা ভেজা হাতের মধ্যে, হালকা স্যাঁতসেঁতে কাপড় ঘেঁষে মায়ের দুই মেয়ে দু'পাশে এসে বসত আর মা একটু একটু করে আকাশের তারা চেনাত তাদের ওই দ্যাখো সপ্তঋষি আর ওই একসঙ্গে তিনটে তারা পরপর, ওই হল কালপুরুষের কোমর বন্ধ। তার নিচে আরও পূবদিকে ওই যে কালপুরুষের কুকুর লুব্ধক জানো ওইটে আকাশের সবচেয়ে ঝকঝকে—ওই দ্যাখো কালপুরুষের কাঁধ দেখতে পাচ্ছ? দেখতে যে সত্যি পেত সবসময়ে এমন নয়, কিন্তু এইটে তার মাথায় আস্তে আস্তে কোথায় যেন বসে যাচ্ছিল যে কত বড় আকাশ...এই সারা আকাশ...

ব্যবহৃত ছবিটি বেনারসের একটি পুরনো এনগ্রেভিং

রো
রোববারের
মেগা

# কলকাতায় নবকুমার



রিহার্সালের শেষে নিরুপমাদি নবকুমারকে তার বাড়ি যেতে বলে। ইতস্তত করে নবকুমার, যায় না। বাড়ি না গিয়ে দুর্বারের অফিসে যায় সে। দুর্গা, ইতির খবরাখবর নিতে। বাড়ির চৌকাঠে পা দিতেই বিকট শব্দ করে বোমা ফাটে। একজন ভদ্রলোকের ডাকে তার ঘরে ঢুকে পড়ে। আগে তাকে দেখেছে নবকুমার। ভদ্রলোকের কথাবার্তা শুনে মাথা ভোঁভোঁ করতে থাকে তার।

## চব্বিশ

**শেফালি মাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।** এই প্রথম ওকে নীল শাড়ি পরতে দেখল নবকুমার। সাতসকালেই স্নান সেরে নিয়েছেন। ঘরে ঢোকামাত্র বললেন, 'একটু পড়া ধর তো!' তারপর দেওয়াল আলমারি থেকে একটা মোটা বই খুলে সূচিপত্র দেখে পাতা খুলে নবকুমারের হাতে দিলেন। নবকুমার দেখল বইটার নাম সঞ্চয়িতা। কবিতার নাম কর্ণকুন্তী সংবাদ।

'তুমি চেয়ারটায় বসো। আমি বসে বসে কবিতা বলতে পারি না।' হাসলেন শেফালি মা। আজ তার বয়স যেন অনেক কম বলে মনে হচ্ছিল নবকুমারের।

চোখ বন্ধ করে শেফালি মা শুরু করলেন, 'পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যাসবিতার বন্দনায় আছি রত। কর্ণ নাম যার, অধিরথসূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত সেই আমি—কহ মোরে তুমি কে গো মাতঃ!'

হাঁ করে শুনছিল নবকুমার। আবৃত্তি থামিয়ে ধমক দিলেন শেফালি মা, 'আরে! তুমি এদিকে তাকিয়ে কী দেখছ? ভুল বলছি কিনা বইয়ে চোখ রেখে দ্যাখো। প্রম্পটার কখনও পাতা থেকে চোখ সরায় না।'

আবার আবৃত্তি শুরু করলেন তিনি। বলতে বলতে আটকে গেলেন এক জায়গায়। নবকুমার ধরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, হাত তুলে ইশারা করলেন কথা না বলতে। কয়েকবার চেষ্টা করলেন মনে করতে। তারপর বললেন, 'নাঃ! সত্যি বুড়ি হয়ে গেছি। স্মৃতি কাজ করছে না। অথচ জানো, সেই প্রথমদিন থেকে, যখন অভিনয়ে এলাম, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এই কবিতা বলে অভিনয় প্র্যাকটিস করতাম। গড়গড় করে বলে যেতাম। অভিনয় ছাড়ার পর স্মৃতির ওপর এভাবে মরচে পড়বে কল্পনাও করিনি। কী যেন লাইনটা?'

নবকুমার বলল, 'ওই পরপারে যেথা জ্বলিতেছে দীপ স্তব্ধ স্কন্ধাবারে পাণ্ডুর বালুকাতটে—।'

শেফালি মা বললেন 'বাঃ। তোমার গলা তো বেশ ভরাট। যখন এমনি কথা বল তখন এরকম লাগে না। তার মানে এই গলা স্বাভাবিক গলা নয়।'

বাকি কবিতাটা শেষ করলেন শেফালি মা। যখন বললেন, 'শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে,/জয়লোভে যশলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,/বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই' তখন গলায় এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যে নবকুমারের চোখে জল এসে যাচ্ছিল। কোনওক্রমে নিজেকে সামলাল সে।

শেফালি মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগল?'

'খুউব ভাল।'

'আগে যা বলতাম তার অর্ধেকও পারলাম না। যাক সে, খাটে গিয়ে বসলেন শেফালি মা, 'তোমার দলের বড়বাবুর বক্তব্য কী?'

'উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।' নবকুমার জানাল।

'কেন?'

'তা জানি না। বললেন গদিতে না যদি যান তাহলে যেখানে হোক বললে যেতে ওঁর আপত্তি নেই। আপনি রাজি হয়েছেন শুনে খুব খুশি হয়েছেন।'

'আমি তোমাকে বলেছি ভেবে দেখব, রাজি হয়েছি বলিনি, ঠিক আছে, ওঁকে এখানে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলবে।'

'ঠিক আছে বলব। আজ ছুটি, কাল বলব।'

'ও। আজ তুমি কী করবে?

'কলিকাতার দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখতে যাব। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কীভাবে যেতে হয়? আর সেখান থেকে গড়ের মাঠ কতদূরে?' নবকুমার জিজ্ঞাসা করল।

'চিড়িয়াখানা?'

'হ্যাঁ। সেখানেও যাব। কিন্তু আজ বোধহয় সব জায়গায় যাওয়া যাবে না।'

'যাবে।' বলে গলা তুললেন, 'মুক্তো, মুক্তো!'

মুক্তো এল দরজায়। শেফালি মা বললেন 'আজাদকে খবর দে। গাড়ি নিয়ে দশটায় যেন দরজায় আসে। তুই এর মধ্যে জলখাবার খাইয়ে দে। নিজেও খাবি। আমরা

নবকুমার বাইরে এসে দেখল ওরা দাঁড়িয়ে কথা বলছে। আর তখনই মেয়েটা মুখ ঘোরাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। একটু অপ্রস্তুত হলেও দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে ছুটকি হাত নেড়ে হাসতে লাগল। কী করা উচিত বুঝতে পারছিল না নবকুমার

তিনজনে ঠিক দশটায় বেরুব। সঙ্গে জলের বোতল নিবি।'

'কোথায় যাব?'

'কলকাতায়, না, কলিকাতার দ্রষ্টব্যস্থান দেখতে। উঃ, কবে যে শেষবার যাদুঘর, চিড়িয়াখানায় গিয়েছি মনেই পড়ে না। নবকুমারের দৌলতে আজ দেখে আসি চল।'

'আপনি যাবেন? সত্যি?' নবকুমার বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'জলে নেমে শুধু কোমর ভেজাব কেন? ডুব দিয়ে স্নানটা সেরে নিই। বুঝলে?'

নবকুমার মাথা নেড়ে বোঝাল, সে বোঝেনি।

শেফালি মা হাসলেন, 'চেষ্টা কর, ঠিক বুঝতে পারবে।'

ট্যাক্সি সোনাগাছি থেকে একটা চওড়া রাস্তায় পড়ে ডান দিকে বাঁক নিতেই পেছনে বসে থাকা শেফালি মা বললেন, 'এই রাস্তাটার নাম জানো?'

এইদিক দিয়ে গদিতে যাওয়া আসা করেনা নবকুমার। মাথা নাড়ল, না।

'সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যু। এখন বলে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু। এই যে রাস্তাটা পেরিয়ে যাচ্ছি, এটা বিডন স্ট্রিট। এই বিডন স্ট্রিটেই মিনার্ভা থিয়েটার ছিল। এখন তো বন্ধ। এককালে বিখ্যাত নাটক ওখানে হয়েছে। উৎপল দত্ত অঙ্গার, কল্লোল ওখানে করেছিলেন। আমিও ওখানে অনেক শো করেছি।'

'এখন বন্ধ কেন?'

'শুনেছি কিসব আন্দোলন হয়েছিল, থিয়েটারের মান পড়ে যাওয়ায় দর্শক হত না। এই রাস্তা হল বিবেকানন্দ রোড।'

শেফালি মা একের পর এক রাস্তার নাম, বিখ্যাত বাড়িগুলোর কথা বলে যাচ্ছিলেন। সবগুলো মাথায় রাখতে পারছিল না নবকুমার কিন্তু তার ভাল লাগছিল।

'এই হল ধর্মতলা। আবার এসপ্ল্যানেডও বলে। ওই যে মনুমেন্ট।'

গাড়িতে বসেই অনেক উঁচু একটা স্তম্ভ দেখতে পেল নবকুমার। বইতে সে পড়েছে ওটা স্মৃতিসৌধ। মানুষের বাস করার জন্যে তৈরি নয়।

'ওটা কার স্মৃতিসৌধ?'

শেফালি মা বললেন, 'অতশত জানি না। এক সাহেবের বোধহয়, কী যেন নাম। অক্টো, অক্টো, দূর!'

গাড়ি আর একটু এগোতেই বিশাল মাঠ চোখে পড়ল।

'এই হল তোমার গড়ের মাঠ। গড়ের মাঠ কেন বলে জানো? গড় মানে দুর্গ। দুর্গের সামনে মাঠ, গড়ের মাঠ।'

'এখানে দুর্গ কোথায়?'

'ওই যে, ওপাশ, দুর্গের নাম উইলিয়াম। ফোর্ট উইলিয়াম।'

'ও। কিন্তু শহরের মাঝখানে দুর্গ কেন? শত্রুরা এলে তো শহরটাকেই দখল করে ফেলবে। বইতে পড়েছি শহর থাকত দুর্গের ভেতরে। যাতে শত্রুরা দখল না করতে পারে।'

হাসলেন শেফালি মা, 'ওটা ইংরেজরা বানিয়েছিল যাতে তাদের কেউ দুর্গের ভেতর ঢুকে না মারতে পারে। তখন তো ঘরে বাইরে ওদের শত্রু ছিল। এখন বাইরের সাত সমুদ্র পার হয়ে এতদূরে আসতে পারবে না।'

'তাহলে ইংরেজদের তৈরি দুর্গটা কি দ্রষ্টব্যস্থান হিসাবে রাখা হয়েছে?'

'না না। ওখানে শুনেছি মিলিটারিরা থাকে।'

কিছু টা দূরে শ্বেত পাথরের বিশাল বাড়ি যা দেখতেই তাজমহলের ছবি মনে ভেসে ওঠে, নবকুমার উৎফুল্ল হল, 'বাঃ, কী সুন্দর।'

পেছন থেকে শেফালি মা বললেন, 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।'

বিস্ফারিত চোখে নবকুমার দেখছিল স্মৃতিসৌধকে।

'ভেতরে যাওয়া যাবে?'

'এখন নয়। ফেরার পথে। ডানদিকে যে ঘেরা মাঠ দেখছ ওটা রেসকোর্স। ঘোড়া দৌড়ায়, কেউ জেতে কেউ হারে। ভুলেও কখনও ওখানে যাবে না।'

ওরা চিড়িয়াখানায় ঢুকল। আজ বেশ ভিড়। লাইন দিয়ে টিকিট কাটতে হল। ভাগ্যিস রোদ নেই, মেঘলা হয়ে আছে আকাশ। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর শেফালি মা বললেন, 'আর পারছি না। আমরা এখানে বসছি। তুমি বাঘ ভাল্লুকদের দেখে এখানে ফিরে এসো। তারপর ওই রেস্টুরেন্টে গিয়ে দুপুরের খাবার খাব।'

নবকুমার মাথা নেড়ে পা বাড়াল। পাখিদের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে সে মুগ্ধ। কত রকমের পাখি। এক ভদ্রলোক তার ছেলেকে বললেন, 'ওই দ্যাখ কাকাতুয়া।'

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'কথা বলে?'

কাকাতুয়া ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলেটাকে দেখল। তারপর স্পষ্ট বলল, 'মারব।'

নবকুমার হেসে ফেলল। পাখি মুখ ঘুরিয়ে নিল।

একটার পর একটা প্রাণী দেখতে দেখতে নবকুমার জলহস্তীদের কাছে পৌঁছাতেই একজন বিশাল হাঁ করে মুখের ভেতরটা দেখাল। কাদাজলে দাঁড়িয়ে আছে সে। জলহস্তী তাকে আকর্ষণ করল না। হঠাৎ খেয়াল হল অনেকক্ষণ সে একা ঘুরছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানল একটা বেজে গেছে। ফিরতে গিয়ে সে ধন্দে পড়ল। ঠিক কোন জায়গায় শেফালি মা-রা বসে আছেন বুঝতে পারছিল না। হাঁটতে হাঁটতে সাপের বাড়ির সামনে পৌঁছে ভেতরে যাওয়ার লোভ সামলাতে পারল না। বড় বড় কাঁচের বাক্সে নানান প্রজাতির সাপ কিন্তু তারা বেশিরভাগই নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চাইছে দর্শকদের কাছ থেকে। দর্শকরা এখানে সংখ্যায় বেশি।

'ছিঃ! সাপ দেখলেই শরীর ঘিনঘিন করে ওঠে। আমি এখানে থাকব না বলে যে মেয়েটি বেরিয়ে যাচ্ছিল তাকে খুব চেনা বলে মনে হল নবকুমারের। পেছন থেকে দেখছে সে, কিন্তু গলার স্বর কোথাও যেন শুনেছে। মেয়েটার সঙ্গে বছর তেইশের একটি ছেলে। সে বোঝাতে বোঝাতে হাঁটছিল। নবকুমার বাইরে এসে দেখল ওরা দাঁড়িয়ে কথা বলছে। আর তখনই মেয়েটা মুখ ঘোরাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। একটু অপ্রস্তুত হলেও দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে ছুটকি হাত নেড়ে হাসতে লাগল। কী করা উচিত বুঝতে পারছিল না নবকুমার। ছুটকি এগিয়ে এল, 'কী? চিনতে পাচ্ছ না? এর মধ্যেই ভুলে

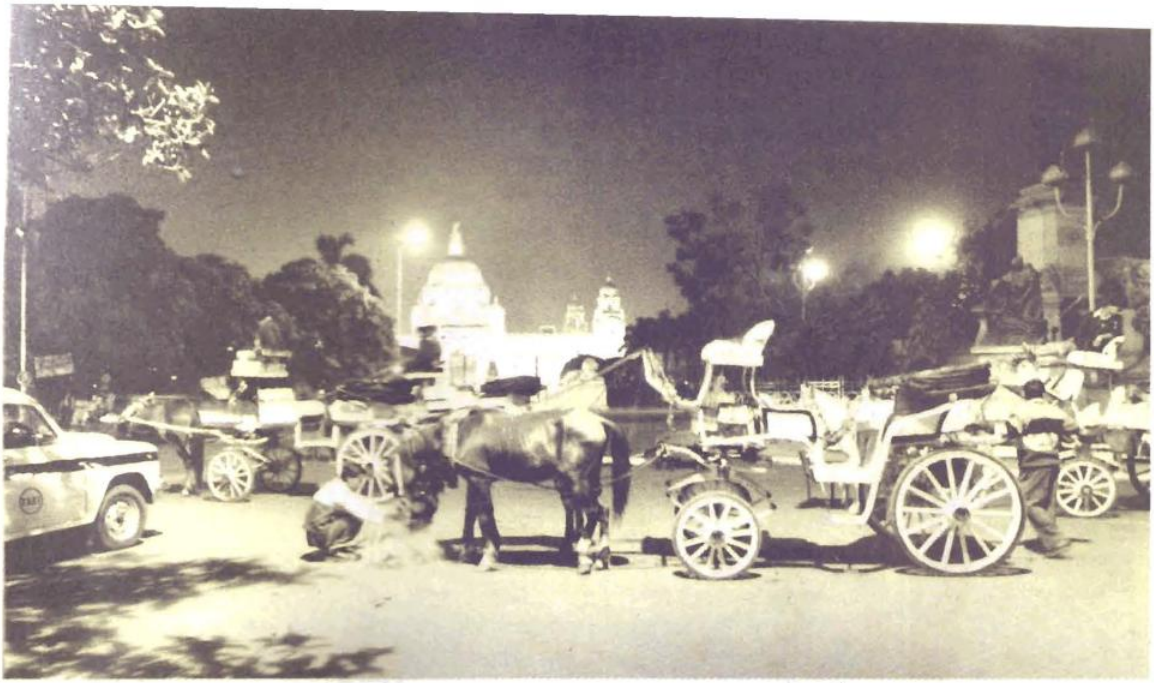

গেলে? আমি ভেবেছিলাম তুমি আর পাঁচটা ছেলের মতো নয়।'

'না মানে—, ভুলব কেন!' তোতলাল নবকুমার।

'সেই যে ট্রেনে এত কথা বললে, কত প্রমিস করলে আর কলকাতার জল পেটে পড়তেই পাল্টি খেয়ে গেলে।' ঠোঁট ফোলাল ছুটকি।

নবকুমার দেখল ছেলেটা দূরে দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কবে ফিরলে?'

'তার মানে?'

'আমি জানতাম তোমার বাবা মা কলিকাতার বাইরে কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে তোমাকে রেখে এসেছে। সেখান থেকে বিয়ের চেষ্টা করছে।' নবকুমার বলল।

'কী করে জানলে? নাকি মনে মনে ভেবে খুশি হলে?'

'আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম।'

'এ্যাঁ? তাই? কবে?'

'কিছুদিন আগে। এখানে আসার পরপরই। তোমার দিদির কাছে শুনেছিলাম।'

'ও!' একটু ভাবল ছুটকি, 'সেদিন বাড়িতে দিদি একা ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার চরিত্র নষ্ট করেছিল?'

'কী যা তা বলছ?'

'ঠিক বলছি। আমি যাকেই ভালবাসব দিদি তার দিকে হাত বাড়াবে। নিশ্চয়ই দিদি তোমার সঙ্গে বাইরে দেখা করে?'

'না। আর দেখা হয়নি। তবে বেরিয়ে আসার সময় পাড়ার ছেলেরা আমাকে ধরেছিল। খুব শাসাচ্ছিল। ওদের একজন নাকি তোমাকে ভালবাসে। শেষে বলল তোমাকে বুঝিয়ে বলতে যাতে তুমিও ওকে ভালবাস।'

নবকুমারের কথা শেষ হওয়ামাত্র বেশ জোরে হেসে উঠল ছুটকি। আশেপাশের লোকজন সেই শব্দে এদিকে তাকাল। হাসতে হাসতে ছুটকি বলল, 'এরকম কয়েক ডজন ছেলে আমার পেছনে ঘুরে বেড়ায়। আমি তাদের পাত্তাই দিই না। যাকে দিয়েছি সে আমার কথা ভাবেই না। তুমি কী গো।'

নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'এই চিড়িয়াখানা কি তোমার বাড়ির কাছে?

'দূর। কোথায় বেলগাছিয়া আর কোথায় আলিপুর।' ছুটকি হাসল, 'ও অনেকদিন থেকে বায়না করছিল তাই আজ বেড়াতে এলাম।'

'ও কে?'

'ভাল করে চিনি না। টালাপার্কে আলাপ হয়েছে। খুব বড়লোকের ছেলে। বলছে আমাকে বিয়ে না করলে পাগল হয়ে যাবে।' হাসল ছুটকি।

'কবে বিয়ে হবে?'

'এ্যাঁ? তোমার মতলব কী বলো তো? যে বলবে তাকেই বিয়ে করতে হবে? আমি কি এত ফ্যালনা? আচ্ছা, তোমার কোনও ফোন নম্বর আছে?

'না।'

'ঠিকানা বলো।'

ইতস্তত করেও শেষ পর্যন্ত চিৎপুরের যাত্রার গদির ঠিকানা বলে ফেলল সে।

ছুটকি বলল, 'ও, তুমিও নর্থে থাক? তাহলে চল, একসঙ্গে ফিরব। যাওয়ার সময় ও অম্বরে খাওয়াবে। তুমি নিশ্চয়ই এখনও অম্বরে খাওনি?'

'আমাকে খাওয়াবে কেন?'

'আমি বললে ও না বলবে কী করে? এসো।' ছুটকি ছেলেটাকে হাত নেড়ে ডাকতেই মুক্তোকে দেখতে পেল নবকুমার। হনহন করে সামনে এসে মুক্তো বলল, 'মা খুব রাগ করছে। এখনই চল।'

বেঁচে গেল নবকুমার। ছুটকি জিজ্ঞাসা করল, 'মা? মা মানে?'

'মায়ের তো একটাই মানে হয়। আসছি।' মুক্তোর সঙ্গে হাঁটতে লাগল নবকুমার।

পরের এপিসোড আগামী রোববার

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাতিকবাবু **গল্প** : সত্যজিৎ রায় **উপদেষ্টা** : সন্দীপ রায় **কমিকস** : অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

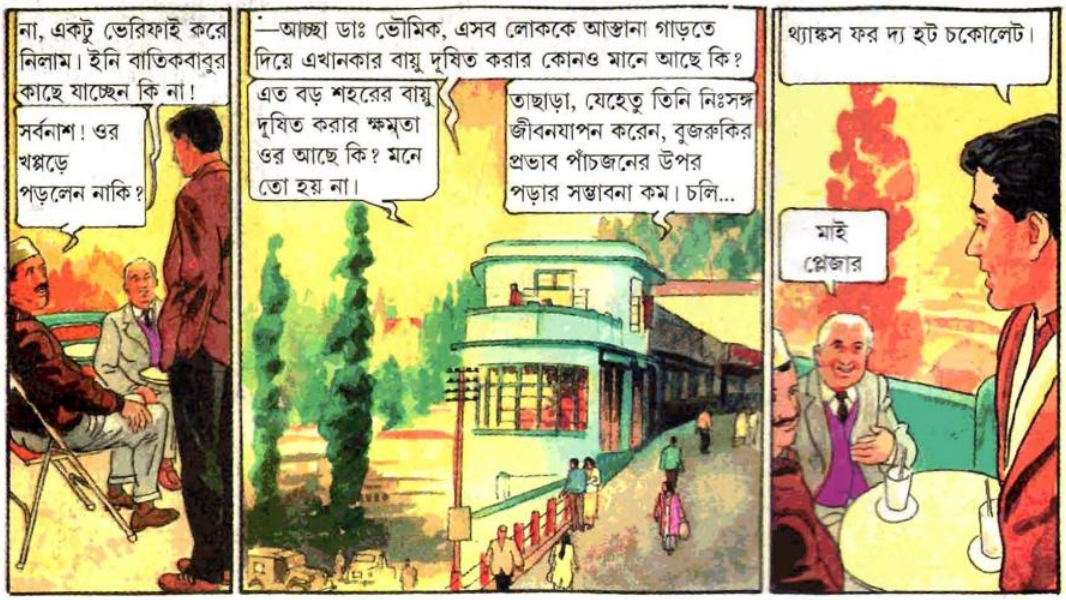

চলবে

সে
সেন
সলিউশনস

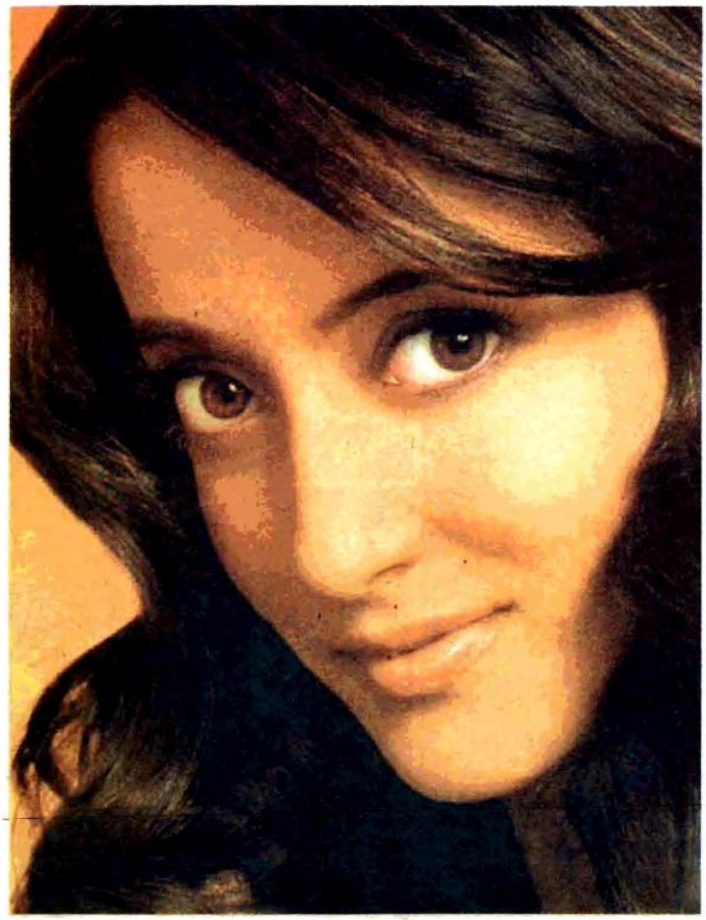

হাত বাড়ালেই
রাইমা। খুচখাচ
ঝামেলা,
টুকটাক
সমাধান। একটু
বন্ধুত্ব আর
অনেকটা
বিশ্বাস।
চিন্তা কিসের,
আপনার কাছে
রাইমা আছে

**আমার মেয়ের বয়স একুশ। কিছুদিন ধরে দেখছি, কথা বলতে গেলেই ও কেমন যেন গুটিয়ে যাচ্ছে। তোতলাচ্ছে। লিখতে গেলেও দেখছি ওর হাত কাঁপছে। সচেতন হয়ে লেখা ঠিক করতে গেলে কাঁপুনি আরও বেড়ে যাচ্ছে। কী করব, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। প্লিজ হেল্প করো।**

—সুচেতনা রায়, সোদপুর

আপনার মেয়ের যেটা হয়েছে, সেটা হচ্ছে 'ফোবিয়া'। 'ফোবিয়া' এক ধরনের অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার। ফোবিয়া মানে শুধু ভয় নয়। ভয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অকারণ দুশ্চিন্তা, প্যানিক ভাব আর প্রচণ্ড রকমের একটা বিরক্তি। তবে শুধু ফোবিয়া নয়, রয়েছে—ল্যাক অফ কনফিডেন্স। তাই এই ব্যাপারে একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিন। আর সবসময় ওর পাশে থাকার চেষ্টা করুন।

**আমার বয়স চব্বিশ। মুখে হালকা সাদা সাদা দাগ হয়েছে। কখনও গালে হয়, আবার কখনও কপালে। ভয় লাগছে, এটা ছুলি নয় তো?**

—তানিশা ভট্টাচার্য, কোন্নগর

আমি যেহেতু ডাক্তার নই তাই একজ্যাক্টলি বলতে পারব না তোমার কী হয়েছে! তবে মনে হয়, এটা শ্বেতী বা ছুলি নয়। তবুও গাফিলতি না করে, একজন ডাক্তারকে দেখিয়ে নাও।

**আমি দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। আমার স্ট্রিম আর্টস। কম্পিউটারের কী কোর্স করলে ভবিষ্যতে কেরিয়ার গড়তে সুবিধা হবে?**

—অনুজ সেন, হাওড়া

তুমি কম্পিউটারের বেসিক অপারেশন জান কি? যদি না জানা থাকে তবে তা শিখে নাও। যেহেতু তোমার স্ট্রিম আর্টস, তাই মাল্টিমিডিয়ার সঙ্গে রিলেটেড বেসিক কোর্স করে রাখলে, আই হোপ সেটা তোমার ফিউচার-এ কাজে লাগবে। এছাড়াও তুমি ডি টি পি-র কোনও কোর্স করতে পারো।

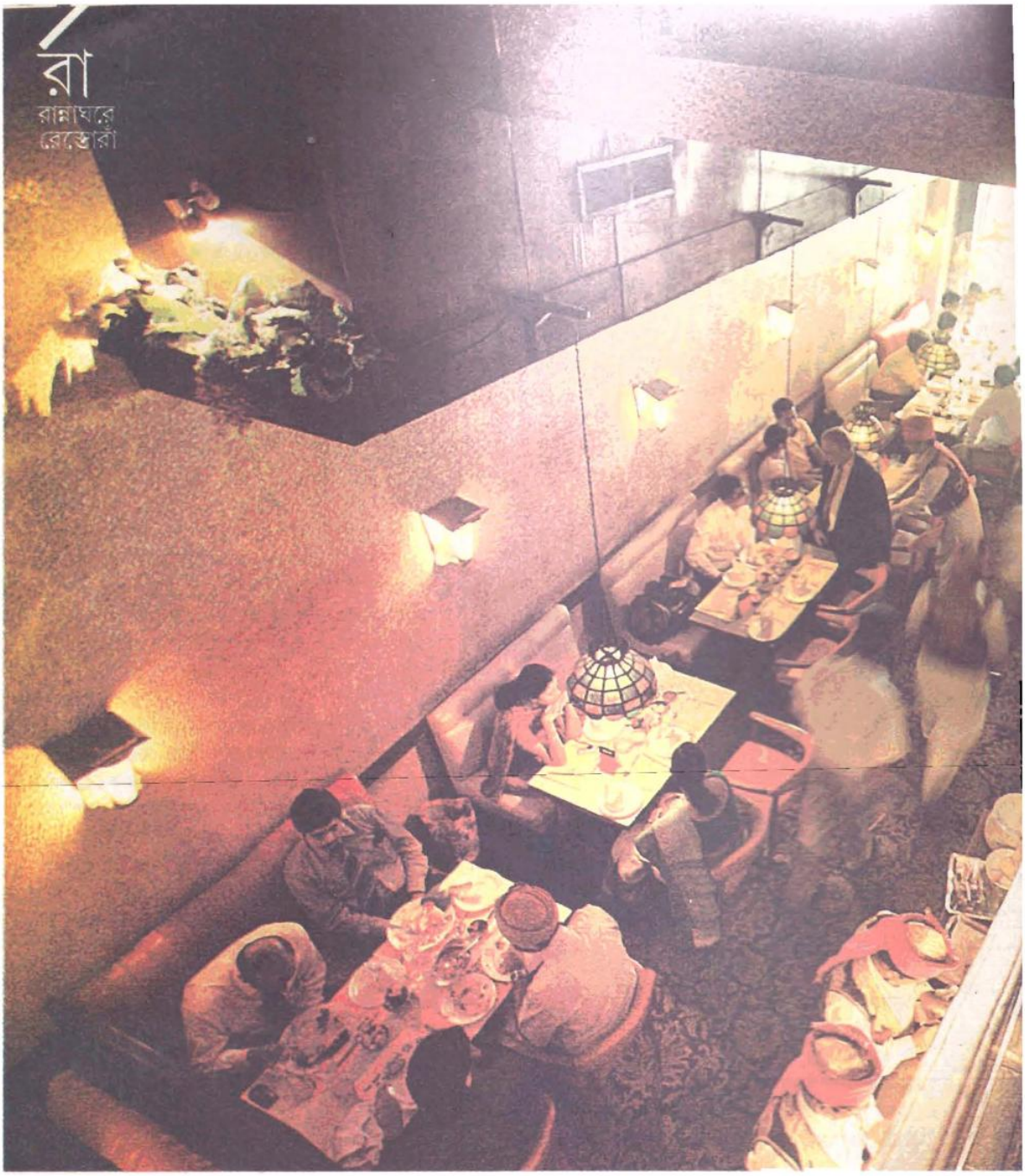

# চেলো চালচিত্র

কত ধানে কত চাল। কত চালে কত মাখন। কত মাখনে কত কাবাব। জানে পিটার ক্যাট-এর চেলো কাবাব।
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী

**ত্রিকুট পর্বত ঘেরি চক্রের নন্দন**
**তার মধ্যে খেলা করে লক্ষ্মী নারায়ণ**
**খেলিতে খেলিতে দেবী পতিরে গ্রাসিল**
**পতিরে গ্রাসিয়া দেবী হাসিতে লাগিল**

বহু প্রাচীন এই হেঁয়ালিটি ভাত রান্নার একটি অনন্য বিবরণ। একটা মাটির উনুনের ওপর মাটির হাঁড়ি। তার মধ্যে রয়েছে জল আর পরিমাণমতো চাল। ফুটতে ফুটতে জল শুকিয়ে ফুলফুলে ভাত তৈরি হল।

বাঙালির এক অভিন্ন দোসর এই ভাত। তাই ভাত রান্নায় জড়িয়ে আছে নানা ধরনের আদব কায়দাও। কেউ খাবে ঝরঝরে, কেউ খাবে একটু নরম, কারুর লাগবে গলা—শুনতে যতটা সহজ, বানাতে নয়, হেঁসেলের রানিরা

বোঝেন তা আদতে কতটা কঠিন। হাঁড়ির জায়গায় এখন চলে এসেছে প্রেসার কুকার, কিন্তু তাতে মুশকিল আসান হয় না। একটা বেশি সিটি হলেই কেলেঙ্কারির একশেষ। আমাদের দেশে বিভিন্ন রকমের চাল পাওয়া যায় যেমন দুধেরসর, রাঁধুনিপাগল, সীতাশাল, চামরমণি, বাসমতি, তুলাইপাঁজি, গোবিন্দভোগ—এদের প্রত্যেকের নিজস্ব জাত আছে তাই রান্নাও করতে হয় পৃথক পৃথক ভাবে। বাংলার চালচিত্রে চাল এবং চাষি দুই মানিকজোড়।

আমরা এখন ডায়েট কনশাস। মেপেঝুপে খাই। তবু ভাত ছাড়তে পারিনি। তাই বোধহয় সারাদিনে একবার ভাত না খেলে এখনও মায়েদের মনে হয় ছেলেমেয়েরা কিছুই খায়নি সারাদিন।

শুধু আমাদের দেশেই নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও নানাধরনের চাল মজুত। তাদের রান্না করারও বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। চালের সঙ্গে এটাসেটা মিশিয়ে তারাও তৈরি করেন অতি উপাদেয় সমস্ত খাবার। যেমন ধরুন ইরানের চেলো কাবাব। শুধু কাবাব নয়—কাবাবের সঙ্গী হয়ে মাখন দেওয়া ভাত পৃথিবীর যে প্রান্তেই গেছে সেখানেই লোকের মন জয় করেছে।

ইরানে নানান ধরনের চাল পাওয়া যায়। পার্সি ভাষায় চালকে বলে 'বেরেঞ্জ'। চম্পা, রশমি, অনবারবু, সাদরি, চেলো আরও নানা ধরনের চাল পাওয়া যায় এদেশে। নানানরকমের চাল, নানান তাদের রাঁধার নিয়ম। চেলো রাঁধতে গেলে প্রথমে চাল ভিজিয়ে তাকে


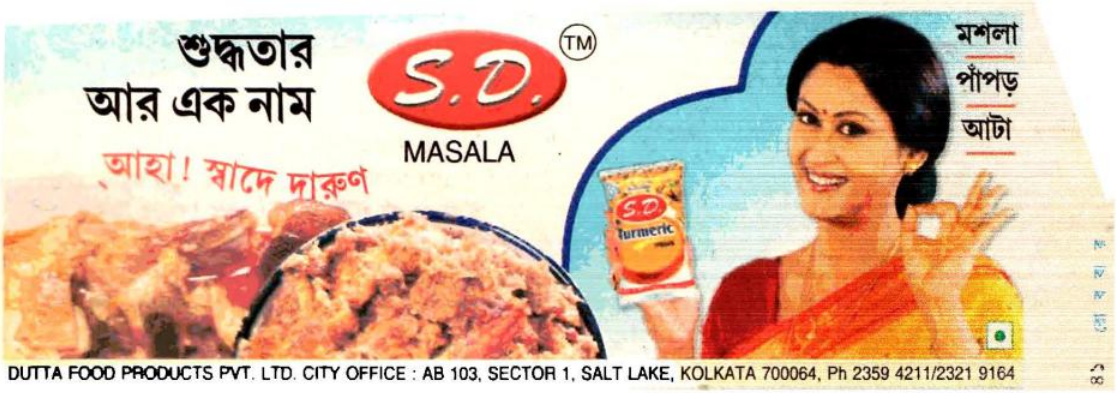

DUTTA FOOD PRODUCTS PVT. LTD. CITY OFFICE : AB 103, SECTOR 1, SALT LAKE, KOLKATA 700064, Ph 2359 4211/2321 9164

অর্ধেক সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে নিয়ে আবার একবার স্টিম বা ভাপ দিতে হয়। ঝরঝরে ভাত তো হয়ই আর পাত্রের নিচে মচমচে বাদামি চালের যে অংশ লেগে থাকে তাকে বলে 'তাক-দিঘ'। ইরানের বাচ্চাদের কাছে এটি বেশ জনপ্রিয়।

কলকাতাবাসীর কাছে ইরানের এই ডিশের ঠেক 'পিটার ক্যাট'। তেহরানে এক বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে রেস্তোরাঁর কর্ণধার নীতিন কোঠারি পৌঁছে যান সেখানে। এক চামচ মুখে দিয়েই বোঝেন যে কলকাতাতে এই আইটেম হিট হবেই। তার এই বিশ্বাস থেকেই কলকাতা উপহার পায় ইরানের এই জাতীয় ডিশটির যার পরতে পরতে রয়েছে মাখন—এক চামচ মুখে দিলেই সপ্তম স্বর্গ।

সেদিন তেহেরানে চেলো কাবাব চেখে কোঠারিবাবু যেমন বুঝেছিলেন যে এই ডিশ হিট হবে তেমনি এটাও পরখ করতে পেরেছিলেন যে কাঁচা ডিম বাঙালির সইবে না। সত্যজিৎবাবু যতই তাঁর বইতে বিশ্বশ্রীকে কাঁচা ডিম খাওয়ান না কেন, বাঙালির মুখে এটি রুচবে না। তাই ভাজা ডিম কাঁচা ডিমের জায়গা নিল।

গরম গরম সুগন্ধিত বাসমতি চাল যার প্রত্যেকটিতে মাখন মাখোমাখো তার ওপর ভাজা ডিম, কয়েক খাবলা মাখন আর কিছু গ্রিলড টমেটো। ওফ! সত্যি স্বর্গ। তবে এখানেই শেষ নয়। প্লেট-এর এক পাশে চিকেন কাবাব যার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে রয়েছে স্টিমড টমেটো, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ। প্লেট-এর অপর প্রান্তে থাকে মাংসের কিমা ভরা মাটন শিক কাবাব। কি জিভে জল চলে এল তো? খাবারের ঘ্রাণে মন যেমন মজবে, তারিয়ে তারিয়ে খেতে জিভ বলবে সার্থক জনম আমার।

পার্ক স্ট্রিট মিউজিক ওয়ার্ল্ড দোকানটির ঠিক পেছনে এই রেস্তোরাঁ। আলোতে ছায়াতে এই পচা গরমের দেশে একটা পারফেক্ট অ্যামবিয়ানস এই রেস্তোরাঁর। অনেক তাবড় তাবড় রেস্তোরাঁ চেলো কাবাব বানায়, তবে পিটার ক্যাট-এর কাছে সবই কেমন যেন ম্লান।

পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁ তাই ভাবছেন বোধহয় ধরা ছোওয়ার বাইরে। একদম ঘাবড়াবেন না , চেলো কাবাবের দাম ১২৬ টাকা। আর এক প্লেট চেলো কাবাব মানে পুরো লাঞ্চ।

এক প্লেট চেলো কাবাব করতে **লাগবে** :

প্রথমে চিকেন কাবাব

চিকেন—৪০০-৫০০ গ্রাম (হাড় ছাড়া)
টমেটো—২ টো
ক্যাপসিকাম—১টা (মাঝারি)
পেঁয়াজ—১টা (মাঝারি)
দই—১/২ কাপ
ক্রিম—১/৪ কাপ
হলুদগুঁড়ো—১/২টি স্পুন
লঙ্কার গুঁড়ো—১/২টি স্পুন
জিড়ে—১/৪টি স্পুন
ধনে—১/৪টি স্পুন
কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো—১/৪টি স্পুন
গরম মশলার গুঁড়ো—১টি স্পুন
কেশর—কয়েকটা, দুধে ভিজিয়ে বাঁটা
পাতি লেবু—১টা (রস)
গোলমরিচ—স্বাদ মতো
নুন—স্বাদ মতো

**এবার**

প্রথমে চিকেন ছোট ছোট টুকরো করে কাটুন।

এরপর টমেটো, ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ কাটুন এমনভাবে যাতে শিকে ঢোকাতে পারেন।

এবার এই সমস্ত সবজি আর মাংস অন্য সব উপকরণের সঙ্গে মিশিয়ে আট ঘণ্টা ম্যারিনেট করুন।

একটা শিকে প্রথমে চিকেন, তারপর ক্যাপসিকাম পেঁয়াজ, টমেটো পরপর সাজিয়ে আভেনে বসান যতক্ষণ না চিকেন নরম হচ্ছে।

এবার বানাতে হবে মাটন কাবাব।

মাটন কাবাব বানাতে **লাগবে** :

মাটন কিমা—২০০ গ্রাম
পেঁয়াজ—১টা,কুচি কুচি করা
কাঁচা লঙ্কা—২টো,কুচি কুচি করা
আদা—১/২ ইঞ্চি,কুচি কুচি করা
জিড়ের গুঁড়ো—১/৪টি স্পুন
গরম মশলার গুঁড়ো—১টি স্পুন
লেবুর—১ (রস)
টক দই—১/৪ কাপ
ডিম—২টো (ভাল করে ফেটান)
কেশর—কয়েকটা, দুধে ভিজিয়ে বাঁটা
ক্রিম—১/৪ কাপ
ধনে পাতা—১ আঁটি, ভাল করে কুচানো
নুন—স্বাদ মতো
গোল মরিচ—স্বাদ মতো

**এবার**

সমস্ত উপকরণ একসঙ্গে মাংসের কিমার সঙ্গে মিশিয়ে তিন ঘণ্টা ম্যারিনেট করুন।

এবার এই মাংসের কিমাটাকে দুই ভাগে ভাগ করুন। ৬/৭ ইঞ্চি লম্বা শিকে ভাল করে ছড়িয়ে আভেন-এ দিন যতক্ষণ না ভাল করে রান্না হচ্ছে।

ভাত করতে **লাগবে**

বাসমতি চাল—১৭০ গ্রাম
মাখন—৫০ গ্রাম
নুন—আন্দাজমতো

**এবার**

প্রথমে চালটাকে ভিজিয়ে রাখুন।

এরপর মাখন, নুন দিয়ে ভাত রান্না করুন। এবার পরিবেশনের পালা। একটা সুন্দর দেখতে ডিনার প্লেটে প্রথমে ভাতটা দিন। ভাতের ওপর একটা ডিম ভেজে দিন। একদিকে সাজান চিকেন কাবাব আর এক দিকে মাটন কাবাব। এবার খানিকটা মাখন আর গ্রিল্ড টমেটো সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

*Approach Roads & Bridges*

*Multi-product SEZ's*

*Several Small & Medium Scale Enterprises*

*Health, Education & Residential Developments*

*Over 17 lakh job opportunities*

## Coming Soon

NKID
NEW KOLKATA INTERNATIONAL DEVELOPMENT

*A City of New Opportunities*

*For the growth and transformation of the economic and social landscape of West Bengal.*

unitech
Dream. Believe. Create.

USE
UNIVERSAL SUCCESS

22, Camac Street, Block-A, 4th Floor, Kolkata - 700 016. India Ph.: +91 33 2289 2000, 6450 2000 Fax: +91 33 2289 1530, +91 98319 53407
E-mail: kolkata@unitechgroup.com www.unitechgroup.com

# লাইফটাইম*

মাত্র

# Rs. 222

Smart Life Power

RELIANCE Mobile

smart
Reliance GSM Service

*শর্তাবলী প্রযোজ্য। স্মার্ট লাইফ পাওয়ার-এ অ্যাক্টিভ থাকার জন্য, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চার্জেস্ ও সরকারী শুল্কের অতিরিক্ত, প্রতি 60 দিনে ন্যূনতম Rs. 75 ডিনোমিনেশনের রিচার্জ আর Rs. 75 মূল্যের ব্যবহার করা আবশ্যক।

Call 98830 98830 (Kolkata)
Call 98320 98320 (Bengal)